স্নেহলতা।

সামাজিক উপন্যাস।

কোন মহিলা কর্ত্তৃক প্রণীত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

কালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৫৫ নং অপর চিৎপুর রোড।

১১ মাঘ, ১২৯৬।

মূল্য ১৲ টাকা।

উৎসর্গ।

া! তোমার ফুল হইতেও সুকোমল হৃদয়খানি,
সতার দুঃখে বড়ই কাতর হুইয়াছিল, তাই তুমি
ক সময় বলিয়াছিলে, "মা! স্নেহকে লোকের
পরিচয় করাইয়া দেও"। কিন্তু অনেক কারণে
তোমার সরল হৃদয়োত্থিত অনুরোধ সে সময়
করি নাই। মা সরলতার প্রতিমূর্ত্তি! তুমি
কোথায়? তুমি ত আর আমাকে অমীয় হাস্য-
া সুধাংশুবদনে সুমিষ্ট স্বরে কোন অনুরোধ
বে না। তুমি ত এ স্বার্থপর সংসারে নাই।
কারময় গভীর বিচ্ছেদার্নবে আমাদিগকে ডুবা-
তুমি স্বর্গের পারিজাত স্বর্গে গিয়া মনোহর
ন্দর্য্যে দেবর্ষিদিগের নয়নরঞ্জন করিতেছ, তাই
আজ অশ্রুজলের সহিত তোমার সুকোমল চারু
স্ত আমার অতীব স্নেহের ধন স্নেহলতাকে অর্পণ
লাম।

তোমার মা—

স্নেহলতা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

প্রস্তাব।

মহানগরী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী বরাহনগর গ্রামে জাহ্নবীতটস্থ একটী উচ্চ প্রাসাদের ছাদের উপর ফুল্লকমলতুল্য একটী বালিকা জাহ্নবীর তরঙ্গমালা পরিশোভিত মধুর মূর্ত্তি অনিমিষ নয়নে অবলোকন করিতেছে। নিম্নস্থ পুষ্পোদ্যান হইতে সুগন্ধ বহন পূর্ব্বক সন্ধ্যা সমীরণ প্রবাহিত হইয়া বালিকার কুঞ্চিত কেশরাশি লইয়া খেলা করিতেছে। পূর্ণিমার নবোদিত চন্দ্রমা আপনার শুভ্র সুধাময় কিরণরাশি বালিকার বিমল শরীরে ঢালিয়া দিতেছে। বালিকার সুস্নিগ্ধ সুধাময় বর্ণ সুধাকরের জ্যোৎস্নার সহিত মিসিয়া যাইতেছে। বালিকার বয়স ষোড়শ বৎসরের অধিক হয় নাই। কিন্তু এই বালিকাবয়সেই বালিকার সুবঙ্কিম সুন্দর ললাটে দুই একটী চিন্তারেখা

স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে। বালিকার কুসুমতুল্য বদন খানি মেঘাবৃত শশীর ন্যায় বোধ হইতেছে।

জাহ্নবী দেবী, তরঙ্গায়িত বিশাল বক্ষে সুধাকরের সুস্নিগ্ধ কিরণরাশি পতিত হওয়ায় আনন্দে স্ফীত হইয়া জগজ্জন বিমোহিত করিয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রবাহিত হইতেছে। জ্যোৎস্নাময়ী নদী সুন্দরী আজ কত ভাবুকের প্রাণে কত প্রকার ভাবরাশি উদয় করিয়া দিতেছে। জ্যোৎস্নামযী বালিকা আজ তোমার হৃদয়-উদ্যানে নদী কি ভাবের উদয় করিয়া দিতেছে?

বালিকা গঙ্গার এই বিমোহনকারী অতুল শোভা দেখিতেছেন, ও মৃদু মধুর স্বরে গুণ গুণ করিয়া গান করিতেছেন। এমন সময় স্নেহমাখা মধুর স্বরে পশ্চাৎ হইতে কে ডাকিল, 'স্নেহ!' এখনও এখানে একলাটী বসিয়া কি করিতেছ? স্নেহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন তাহার প্রিয় সহচরী ভ্রাতৃজায়া উষাবতী আসিয়াছেন। বালিকা মেঘোন্মুক্ত শশীর ন্যায় আনন্দ বদনে দুই বাহুর দ্বারা উষাবতীর গলদেশ বেষ্টন করিয়া কহিলেন "বো ঠাকরুণ তুমি আসিতে এত দেরী করিলে কেন? কি করিতেছিলে!"

উষা। তোমার দাদা এমন এক কথা তুলিয়াছিলেন যে সে কথার প্রলোভন ছাড়িয়া কিছুতেই আর

উঠিতে পারিতেছিলাম না। কথাটা আমারও এত মিষ্ট লাগিতেছিল যে শীঘ্র শেষ করিতে কোন মতেই ইচ্ছা হইতেছিল না। স্নেহ আগ্রহের সহিত বলিলেনঃ কি কথা হইতেছিল? বল না বৌ ঠাকরুণ। তোমাদের সব ভাল ভাল কথার সময় বুঝি আমায় ডাকিতে নাই। উষা একটু হাসিয়া কহিলেন, শুনিবে কি কথা কহিতেছিলাম? তোমার বিয়ের দিন তোমাকে কেমন দেখাইবে, তুমি কি করিবে, অমৃত বাবু বর সাজিয়া আসিলে তাঁহাকে কেমন দেখাইবে, কি কি তামাসা কি কি আমোদ করা যাইবে এই সব নানা রকম কথা হইতেছিল। এই সকল কথা শুনিলে তুমি লজ্জাবতী মাটীর সঙ্গে মিসিয়া যাইতে, তোমায় ডাকিয়া আর কি করিব? এই সব কথা শুনিতেও তুমি ভালবাস না। এখন চল্ তোর ছবি দেখাইবি? তুই বড় দুষ্ট হয়েছিস্, কাল তোর ছবি আসিয়াছে আর আমায দেখাস্ নাই। তুই দিন দিন যেন কি হইয়া যাইতেছিস্। তোর আর সে হাসি নাই, সে গান নাই, সদাই একলা একলা থাকিতে ভাল বাসিস্; অমনতর দুষ্টামি করিলে আমি আর তোর সঙ্গে কথা বলিব না।

স্নেহ। রাত দিন আমার মুখ দেখিতেছ তবু সাধ মিটে না? ছবি দেখাই নাই বলিয়া আমায় এত-

গুলি কথা বলিলে। আমি দাদার কাছে বলিয়া দিব।

উষা। আচ্ছা বলিয়া দিস্ এখন, চল্ তোর ছবি দেখাইবি। এই বলিয়া স্নেহলতার হস্তধারণ পূর্ব্বক উভয়ে প্রস্থান্ করিলেন। স্নেহ অগত্যা স্বীয় কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক ছবি দেখাইতে লাগিলেন। ও উভয়ে ছবির দোষগুণ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময় পার্শ্বস্থ কক্ষে দুই জনের কথোপকথন তাহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। দুই জনের মধ্যে একজন পুরুষ অপরা রমণী। রমণী ধীরে ধীরে কহিলেন দেখ অমন সোনার চাঁদ ছেলে ছাড়িও না। এমন সর্ব্বগুণসম্পন্ন পাত্র মিলা ভার। অমৃত লালের ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত দেখা যায় না, যেমন কার্ত্তিকের মত রূপ তেমনই গুণ, বাছার গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। হইবে না কেন এই বয়সে তিন চারিটা পাশ দিয়াছে।

পুরুষ। তা তুমি যতই কেন বল না আমি কখনই সেই কুলহীন ব্রহ্মজ্ঞানীর সহিত বিবাহ দিব না। তুমি কি করিয়া বল! আমার কন্যা তাকে দিব? ছোঁড়া ব্রাহ্মণের সন্তান হইয়া জাতমানের বিচার করে না; গুণ ত ভারি, এক গুণের মধ্যে দেখি ছোট লোকের ঘরে রোগীর পাশে দিন রাত পড়ে থাকে।

ছোঁড়ার একটু ভদ্রাভদ্র জ্ঞান নাই। সেই দিন রাস্তা দিয়া যাইতে যাইতে দেখি রাস্তার পাশে একটা মুচির কুঁড়ে ঘরের ভিতর বসিয়া মুচি বেটার মুখে ঔষধ ঢালিয়া দিতেছে। শেষে সেই দিন আপনিই বলিল সেই বেটার ওলাউঠা হয়েছিল। আমি ত শুনিয়া একেবারে শিহরিয়া উঠিলাম। কতগুলা পাশ করিয়াছে, না করিয়াছে তাহা দেখিয়া আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। তাহার বিদ্যা আছে, সে বিদ্যাতে আমার কোন আবশ্যক নাই।

রমণী দুঃখমিশ্রিত ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ,ভিক্ষুক বহু মূল্য হীরককে কাঁচ মনে করিবে তাহাতে বিচিত্র কি? আহা! এমন অন্যায় কাজ করিতে তুমি তাহাকে দেখিয়াছিলে! বাছার আমার ঐ গুণেই ত সকলে মোহিত। অমন হীরের টুকরো ছেলে তোমার পছন্দ হইবে কেন? তা তুমি যাহাই কেন বল না, তুমি মনে করিও না যে আমি আমার সোনার চাঁদ স্নেহকে অপদার্থ কুলসর্ব্বস্ব কুলীনের হাতে দিয়া, বাছার আমার চির সুখে জলাঞ্জলি দিব। তৎপরে বোধ হইল পুরুষ ক্রোধমিশ্রিত স্বরে কহিল আমি কখনই কুলমানে জলাঞ্জলি দিয়া কন্যার বিবাহ দিব না।”

রমণী নম্রস্বরে কহিলেন, “তোমার পায় পড়ি

আব গোল করিও না, অস্বীকার করিও না। দাদার এই পাত্র অত্যন্ত মনোনীত হইয়াছে। আর আমার স্নেহের ভাব গতিক দেখিয়া বোধ হয় সে অমৃত-লালকে পছন্দ করিয়াছে। কিন্তু তোমার ভাবগতিক দেখিয়া বাছার আমার আর সে প্রফুল্লতা নাই। যে আমাকে দেখিবা মাত্র মা বলিয়া কত সোহাগ জানাইত, সে এক্ষণে আমার চক্ষের অন্তরে নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসে।" আমার দুধের মেয়ে স্নেহ এখন গম্ভীর হইয়াছে। সে হাসিমাখা মুখে আর সে হাসি নাই। আহা! বাছাব আমার, অমন সোনার বর্ণ ছিল কালী হইযা যাইতেছে। তোমার কি তার মুখ দেখিয়া একটুও কষ্ট হয় না?" এই বলিতে বলিতে রমণীর কণ্ঠ রোধ হইল, বোধ হইল রমণী কাঁদিতেছে।

পুরুষ। "তোমার দাদাব এইরূপ পাত্র পছন্দ না হইবার কারণ কি? তিনি যেমন তাঁর পছন্দও তেমনই। তাঁর পছন্দাপছন্দে আমার কোন আবশ্যক নাই। হুঁ তখনই বলিয়াছিলাম মেযেকে লেখা পড়া শিখাইবার আবশ্যক নাই। কন্যা আমার চাকরী করিয়া খাওয়াইবে না। হিন্দুর মেয়ের আবাব লেখা পড়ার প্রয়োজন কি? এখন দেখ কি ভয়ানক কথা, হিন্দুব মেযে হযে কি না ইচ্ছামত বিবাহ

করিতে চাহে। দুর্গা! দুর্গা! আমার জাতী, কুল, মান, সকল গেল। তুমি নিশ্চয় জানিও আমি কখনই অমৃতের সহিত স্নেহের বিবাহ দিব না, না, না, তুমি আর আমায় ঐ সম্বন্ধে কোন কথাই বলিও না।”

তাহার পর রমণী তেজের সহিত বলিতে লাগিলেন স্নেহ আমার, তোমার স্নেহের প্রত্যাশিনী তা যখন তোমার বিন্দুমাত্র নাই তখন আমার স্নেহ তোমার কিছুরই প্রত্যাশা করে না। আমিই আমার স্নেহকে মনোমত পাত্রে অর্পণ করিব। রমণার এই শেষোক্ত কথা শেষ হইতে না হইতে পুরুষ ক্রোধে অধীর হইয়া আঘাতপ্রাপ্ত সর্পের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া ক্রোধকম্পিত স্বরে বলিতে লাগিলেন— “তোমার কন্যা লইয়া তুমি থাক, আমার সহিত তোমার কোন সম্পর্ক নাই। আমি এ জন্মের মত চলিলাম এই বলিয়া বেগে গৃহ হইতে বহিস্কৃত হইয়া প্রস্থান করিলেন।”

পাঠক মহাশয় বোধ হয় ইহাঁদের পরিচয় জানিতে ইচ্ছুক হইয়া থাকিবেন। ইহাঁরা আমাদের পূর্ব্ব-বর্ণিতা স্নেহলতার জনক জননী।

স্নেহলতা ও উষাবতী এতক্ষণ নীরবে এই সকল বাক্য পরম্পরা শুনিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে স্নেহলতার সেই আয়ত নীলোৎপল চক্ষু দুটী অশ্রুতে

পূর্ণ হইয়া আসিল। উষাবতী সযত্নে স্নেহের অশ্রু মুছাইয়া কহিলেন, "ছি দিদি, ওকি তুমি কাঁদ কেন?"

স্নেহলতা কিছুক্ষণ পরে কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন, "ভাই বৌঠাকরুণ! আমার বড়ই লজ্জা করে; এঁরা এই সামান্য বিষয় লইয়া এত বিবাদ করেন কেন? আমি বাবার মুখেই ত শুনিয়াছি যে তাঁহাদের দেশে এমন অনেক কুলীনের মেয়ে আছেন তাঁহারা চিরকাল কুমারী থাকিয়া দিন যাপন করেন। আমিও চিরদিন তাঁদের সেবা করিয়া সুখে দিন কাটাইব"।

বুদ্ধিমতী উষাবতী স্নেহের সুন্দর হাতখানি আপন হাতে লইয়া কহিলেন, "স্নেহ দেখ কেমন সুন্দর জ্যোৎস্না হইয়াছে। চল আমরা এ বাগানে বড় বড় বেল গোলাপগুলি তুলিয়া আনি। তোমার দাদাকে যে আজ মালা গাঁথিয়া দিবে বলিয়াছিলে"। স্নেহলতা অগত্যা অনিচ্ছাপূর্ব্বক উষাবতীর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

উষা বড় আমোদিনী। কাহারও ম্লান মুখ দেখিতে পারে না। নানা প্রকার হাস্যামোদ করিয়া অল্প সময়েই স্নেহকে হাসাইলেন, কিন্তু এ হাসি বাহিরের।

আমরা এই সময় পাঠক পাঠিকাদিগকে এই

ললনাদ্বয়ের পরস্পর সম্বন্ধের বিষয় কিছু বলিয়া রাখি। স্নেহলতা কুলীন-কন্যা মাতামহালয়েই প্রতি-পালিতা। স্নেহলতার মাতামহের নাম রামদাস রায়। ইঁনি একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। ইহার সর্ব্বশুদ্ধ তিনটী সন্তান, এক পুত্র দুটী কন্যা। পুত্রটীর নাম চুনিলাল। জ্যেষ্ঠা কন্যাটীর নাম শ্যামাসুন্দরী, কনিষ্ঠার নাম হরসুন্দরী। রামদাস মহাশয় কুলমর্য্যাদা বৃদ্ধির নিমিত্ত জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্যামাকে উচ্চ কুলীনের হাতে অর্পণ করেন। শ্যামাসুন্দরীর স্বামী যদুনাথ বন্দোপাধ্যায় বিবাহ করিয়া অবধি রামদাস মহাশয়ের বাড়ীতেই ঘরজামাই রূপে অবস্থান করেন। ইঁহার বাড়ী বিক্রমপুর। রামদাস মহাশয় দ্বিতীয় কন্যা হরসুন্দরীকে অবিবাহিত অবস্থায় রাখিয়াই পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে চুনিলালই তাঁহার বহুতর সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারী হইলেন। চুনিলাল অতি সদাশয় উদার প্রকৃতির লোক। অর্থই অনেক সময় ধনী পুত্রের অনর্থের মূল হয় কিন্তু চুনিলাল সেরূপ প্রকৃতির লোক নহেন। বৃদ্ধ রামদাস মহাশয়ের চরণতলে বসিয়া অতি উৎকৃষ্টতর শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। পিতার ত্যজ্য সম্পত্তি অতি সাবধানে নানা প্রকার সংব্যয় করিয়া পিতার সুকৃতি বিস্তার করিতে লাগিলেন। তিনি আপন

কনিষ্ঠাদ্বয়কে নিরতিশয় স্নেহ করিতেন। তিনি হরসুন্দরীকে হরসুন্দরীরই ইচ্ছানুরূপ পাত্রে বিবাহ দিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে হরসুন্দরীর অতি সুন্দর একটী পুত্র হয়। পুত্রটীর বয়স যখন দুই বৎসর সেই সময় হঠাৎ হরসুন্দরী অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হন। পুত্রটীকে শ্যামা রাখিবার জন্য অনেক যত্ন করেন কিন্তু পুত্রের পিতা অক্ষয় বাবু কোন মতেই স্বীকাব হইলেন না। আপনার নিকট রাখিয়া অতি যত্নে লালন পালন করিতে লাগিলেন ও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রকার বিদ্যাভাস করাইতে লাগিলেন।

বালকটীর নাম সুশীলকুমার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে শ্যামাসুন্দরী তাঁহার পিতৃগৃহেই অবস্থিতি করেন। তাঁহারই এই একমাত্র কন্যা স্নেহলতা।

চুনিলালেব একটী মাত্র পুত্র নাম হীরালাল। হীরালাল পিতার উপযুক্ত পুত্র। জগতেব যেন সমুদায সৎগুণেই হীরালাল শোভিত। হীরালাল অতি অল্প বয়সেই অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভা প্রভাবে নানা শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করিযাছেন। চুনিলাল হীরালালের উপযুক্ত সমযে বিবাহ দিয়া পরমসুন্দরী নানা সৎগুণ সম্পান্না পুত্রবধূ গৃহে আনিযা গৃহ উজ্জ্বল করিয়াছেন। চুনিলালের গৃহে সর্ব্বদাই সুখ শান্তি

বিরাজিত। চুনিলালের এই পুত্রবধূই আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিতা উষাবতী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। স্নেহলতা তাঁহার সুসজ্জিত কক্ষমধ্যে বাতায়ন সন্নিধানে একাকী একখানি চৌকির উপব বসিয়া আছেন। উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া চন্দ্রকিরণ আসিযা তাঁহাব কুসুমসদৃশ বদন-মণ্ডল চুম্বন করিতেছে। মৃদু সান্ধ্য সমীবণ আসিয়া নিম্নস্থ জাহ্নবী-সলিল স্পর্শ করত গৃহ মধ্যে সঞ্চারণ করিতেছে। উচ্চ কণ্ঠে সারি গাহিতে গাহিতে মাঝিবা সুন্দব সুন্দর তবণীগুলি ঝপ্ ঝপ্ শব্দে বাহিয়া চলিযাছে। নিম্নস্থ রাজপথ দিয়া কত লোক আসিতেছে, যাইতেছে, কেহ হাসিতেছে, কেহ গাহিতেছে, সকলেই যেন কার এক গুপ্ত উদ্দেশ্যে জগতময় পরিচালিত হইতেছে। বুঝে না জানে না তবুও জগতের কাজ করিয়া সুখী হইতেছে। স্নেহলতা একাগ্রমনে এই সকল পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য ভাব ভাবিতেছেন, দেখিতেছেন, এমন

সময় একটী যুবা সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। স্নেহ তাহা দেখিতে পাইলেন না। যুবা দেখিলেন স্নেহ ম্লান বদনে কি যেন ভাবিতেছেন। স্নেহের সেই সুকুমার বদনখানি মলিন চিন্তাযুক্ত বোধ হইতেছে। যুবা ধীরে ধীরে ডাকিলেন স্নেহ! স্নেহ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন অমৃতলাল তাঁহার নিকটে। তাঁহার সুন্দর হৃদয় খানিতে মুহূর্ত্তের জন্য কি যেন একটু অব্যক্ত সুখের বিদ্যুৎ খেলিল, মুহূর্ত্তের জন্য আনন্দ রাশি হৃদয়খানি অধিকার করিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে বড় বড় চক্ষুদুটী সহিত সুন্দর বদনখানি লজ্জাবতী লতার ন্যায় অবনত হইয়া পড়িল। অমৃতলাল কহিলেন "স্নেহ! আজ আমি বাড়ী যাইব, তাই তোমাদের কাছে বিদায় লইতে আসিযাছি।" কথার প্রত্যুত্তর না পাইযা পুনর্ব্বার কহিলেন "স্নেহ! আমি তবে যাই!" স্নেহ এবারেও কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের পূর্ব্ব মুহূর্ত্তের সুখরাশি অন্তরিত হইয়াছে। তৎ পরিবর্ত্তে তাঁহার কোমল হৃদয যেন কোন এক অসহ্য মর্ম্মভেদী যাতনা অনুভব করিতেছে। অমৃতলাল এবার ব্যাকুলভাবে কহিলেন "স্নেহ! বিদায় দেও"।

স্নেহ এবার ধীরে ধীরে অমৃতলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পুনরায় অবনতমুখী হইয়া আপন বস্ত্রাঞ্চল

খুঁটিতে লাগিলেন। স্নেহ যে রূপ ভাবে অমৃতলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন, সেরূপ মর্ম্মভেদী দৃষ্টি অমৃতলাল আর কখন দেখেন নাই। তাঁহার হৃদয় যেন কি একটা অসহ্য যাতনা পাইল। তিনি নিকটস্থ একখানি চৌকিতে বসিয়া পড়িলেন এবং ধীরে ধীরে কহিলেন স্নেহ! আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি ?

স্নেহ এবার উত্তর না করিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, বীণানিন্দিত স্বরে কহিলেন ; "আপনি অপরাধ করিবেন" ! কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, স্নেহ নীরব হইলেন।

অমৃতলাল যে স্বর শুনিবার জন্য ব্যাকুল হইতেছিলেন, এতক্ষণ পরে সেই সুধামাখা স্বর শুনিলেন। তাঁহার হৃদয়ের অন্ধকার কথঞ্চিত দূর হইল। তিনি কহিলেন স্নেহ! আজ তোমায় এত ম্লান দেখিতেছি কেন ? এই এক সপ্তাহ হইল আমি এখানে আসি নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে তোমার সকলি যেন কেমন নূতন নূতন দেখিতেছি। ইহার কারণ বলিয়া আমার সংশয় দূর কর। বল তোমার এই আকস্মিক ভাবান্তরের কারণ কি" ? স্নেহ মৃদু শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিলেন ভাবান্তর কি" ?

অমৃতলাল পুনর্ব্বার কহিলেন "স্নেহ! আজ

আমি আমার জীবনের শুভাশুভের বিষয় তোমার মুখে শুনিব। আমি বড় আশা করিয়া আসিয়াছি স্পষ্ট বলিয়া আমায় সুখী করিবে না কি" ?

স্নেহের বদনমণ্ডল ঈষৎ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিল। কি জানি অনিচ্ছায আবারও তাহার হৃদযের নিভৃত স্থানে কি একটা ভাব খেলিয়া গেল, তিনি মৃদুস্বরে কহিলেন।" জানি না কি বলিব," কথাটা আবারও কেমন ভার ভার হইয়া আসিল।

অমৃত। "আমাব প্রাণের কথা কিছু কি তোমার জানিতে বাকি আছে ? যদি থাকে বল প্রাণ খুলিয়া সব বলি, কিন্তু জানি না কোন্ অপরাধে আজ পর্য্যন্ত তোমার হৃদযের কোন কথাই জানিতে পারিলাম না, অপরাধ লইও না সাহস পাইয়াছি, তাই ক্ষুদ্র হইয়াও তোমার মনোভাব জানিতে চাই। স্নেহ ! আজ জানি না কেন বড় ইচ্ছা হইতেছে তোমার মুখে শুনিব তোমার পবিত্র ভালবাসার কিছুমাত্র অধিকারী হইয়াছি কি না" ?

স্নেহ একটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অমৃতলালের ঔৎসুক্যপূর্ণ বদনের প্রতি একবার দৃষ্টি করিলেন। সেই নিশ্বাস ও সেই সকরুণ দৃষ্টি অমৃতলালের হৃদয় ভেদ করিল। তিনি আবারও ব্যাকুলভাবে কহিলেন "স্নেহ ! উত্তর দাও"।

স্নেহ। "আপনাকে আমি কি, বলিব, আপনি জানুন আমি আপনার পবিত্র প্রেমের প্রতিদান করিতে পারি নাই। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ভুলিয়া জান, এই আমার আপনার কাছে একমাত্র প্রার্থনা"।

অমৃতলালের মস্তকে যেন সহসা অশনিপাত হইল। তিনি স্নেহলতার কথার কি প্রত্যুত্তর করিবেন ঠিক করিতে পারিলেন না।

স্নেহ পুনর্ব্বার কহিতে লাগিলেন "আপনি জানুন আমি আপনার অকৃত্রিম ভালবাসার প্রতিদান করিতে পারি নাই। আমার ভালবাসায় আপনি কদাচ সুখী হইতে পারিবেন না। যে সৌভাগ্যবতী আপনার অকৃত্রিম পবিত্র প্রেমের প্রতিদান করিয়া কৃতার্থ হইবেন, আপনি তাঁহাকে আপনার এই নির্ম্মল, পবিত্র প্রেম দান করিয়া সুখী হউন এবং এই অভাগিনীকে সুখী করুন"।

বালিকা অল্পভাষিণী স্নেহ কখন অমৃতলালের সহিত এরূপ ভাবে কথা বলেন নাই, হৃদয়ের আবেগে তিনি আবারও কহিতে লাগিলেন, "যখন জানিব আমার ভাবনা হইতে আপনি মুক্ত হইয়াছেন তখনই বোধ হয় এ সংসারে সুখী হইতে পারিব," বলিতে বলিতে তাঁহার আকর্ণ লোচনদ্বয় অশ্রুপূরিত হইল। বালিকা বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা মুখ আবৃত করিলেন।

অমৃতলাল এই হৃদয়ভেদী পরিবর্ত্তনের কারণ কিছু মাত্র অনুভব করিতে পারিলেন না। তিনি শূন্য হৃদয়ে অধীর ভাবে কহিলেন "স্নেহ! আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি"? স্নেহ চেষ্টা করিয়াও কোন উত্তর করিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ অবরোধ হইয়া আসিল। অমৃতলাল পুনর্ব্বার কাতর চিত্তে কহিলেন, "স্নেহ! তুমি কি জান না তোমার এক ফোঁটা চক্ষের জল আমার হৃদয়ের রক্ত। স্নেহ বল কেন কাঁদিতেছ? আর আমায় অন্ধকারে রাখিও না।" অমৃতলাল প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষায় স্নেহের লাবণ্যময়ী মুখখানির প্রতি চাহিয়া রহিলেন। অগত্যা তাঁহারও আয়ত নয়নদ্বয় শুষ্ক রহিল না। কিছুক্ষণ পরে স্নেহ বদনাবরণ উন্মোচন করিলেন। অমৃতলাল মোহিত হইলেন, তিনি অনিমিষ নয়নে তাঁহার সুধাংশু বদনের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিলেন স্নেহের আমার রোদনেও অপূর্ব্ব শোভা। স্নেহলতার আরক্তিম নয়নদ্বয় সলিলসিক্ত কমলের ন্যায় বোধ হইতেছে। তাঁহার নিবিড় কুটিল কুঞ্চিত কৃষ্ণ কেশরাশি আলুলায়িত রূপে ঘুরিয়া ফিরিয়া বক্ষে পৃষ্ঠে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাঁহার নয়নদ্বয় অবনত, শরীর অস্পন্দ, ওষ্ঠাধর মুদ্রিত, উহা কেবল এক একবার সুন্দর দন্ত দ্বারা দষ্ট হইতেছে।

অমৃতলাল বিমোহিত চিত্তে কহিলেন "স্নেহ বল এই রূপ যাতনা দিতেছ কেন" ?

স্নেহ কেন রোদন করিয়াছেন, কি বলিবেন, রোদন করিয়াছেন বলিয়া লজ্জিত হইয়াছেন। এ-বারেও অমৃতলালের কথার উত্তর দিতে পারিলেন না। অমৃতলাল পুনরপি কহিলেন, স্নেহ! তুমি কি অনুভব করিতে পারিতেছ না আমার কি অসহ্য যাতনা হইতেছে, বল কেন কাঁদিতেছ ?"

স্নেহ। "বলিব, আজ আপনাকে সকলি বলিব কিন্তু আমার একটী প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে। আপনি বলুন আমার আশা ত্যাগ করিয়া আমায় সুখী করিবেন ?"

অমৃত। "কি বলিতেছ স্নেহ! তোমার কথাত আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার আশা ত্যাগ করিব, যাহার ভাবনা ভাবিয়া অতুল সুখ অনুভব করি, যাহার ভাবনায় আমি অসুস্থাবস্থায় সুস্থতা পাই, তাহার ভাবনা ত্যাগ করিয়া আমি কি লইয়া থাকিব ? স্নেহ! তুমি এমন নির্দ্দয় হইলে কেন! তুমি বার বার আমায় এমন অসহ্য কষ্ট দিতেছ ? শীঘ্র সমুদায় খুলিয়া বল। তুমি বুঝিতেছ না তোমার এই কষ্টের অংশী হইবার জন্য আমার প্রাণ কতদূর ব্যাকুল হইতেছে ?"

স্নেহ। "আপনার এই স্নেহই ত—এই অমূল্য ভাল বাসাই ত আমার দুঃখের মূল। এই ভাল বাসা বিস্মৃত হউন, আমায় রক্ষা করুন" বলিতে বলিতে আবার সেই বড় বড় চক্ষুদুটী অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া আসিল। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোমল হস্ত দুইখানি দিয়া তাহা মুছিয়া ফেলিলেন। তৎপরে তাঁহাদের পরিণয় সম্বন্ধে তাঁহার পিতার মত জানাইলেন। অমৃত লাল সমুদায় শুনিযা কিছুক্ষণ নীরবে রহিলেন। তৎপরে উভযের নীরবতা ভেদ করিয়া অমৃতলাল কহিলেন, "কেন স্নেহ তোমার মাতার ত ইচ্ছা আছে তবে আমি নিরাশ হইব কেন ?" যদিও এই ঊনবিংশ শতাব্দিতে স্নেহলতার জন্ম, এই ঊনবিংশ শতাব্দিতে তিনি শিক্ষিতা কিন্তু দুর্ভাগ্যই বল আর সৌভাগ্যই বল, স্নেহলতা সেরূপ শিক্ষা পান নাই যাহাতে পিতৃমাতৃ ভক্তি হইতে তাঁহাকে দূরে ফেলিবে। তিনি আপনাকে অনেক পরিমাণে পিতা মাতার অধিকারভুক্ত বলিযা মনে করেন। পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, আত্মীয়, বন্ধু, বান্ধব জগতের যাহার যাহা প্রাপ্য তাহাকে তাহা অর্পণের নিমিত্ত তাঁহার ক্ষুদ্র হৃদয়খানি সদাই উন্মুক্ত। তাই অমৃত লালের কথায় স্নেহ কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃদু শুষ্ক হাস্য করিয়া কহিলেন, মার

খুব ইচ্ছা আছে ইহা সত্য, কিন্তু আপনি কি মনে করেন, বাবার মনে কষ্ট দিতে তাঁহাকে অবমাননা করিতে আমার ইচ্ছা হইবে? আরও আপনি কি জানেন না, হিন্দুরমণীগণের স্বামীই এক মাত্র দেবতা, স্বামী সহস্র দোষে দোষী হইলেও সর্ব্বদা তাঁহাদের চিত্ত সেই স্বামীপাদেই ন্যস্ত থাকে। তাঁহারা স্বামীর আজ্ঞা পালন করিয়া কৃতার্থতা অনুভব করেন। স্বামীর বদন ম্লান দেখিলে তাঁহাদের হৃদয়ে যেন বজ্র-পাত হয়, স্বামীর বদন প্রফুল্ল দেখিলে তাঁহারা স্বর্গসুখ অনুভব করেন। বাবা বাড়ী যাওয়া অবধি মার মনে কি সুখ আছে? তাই আবারও বলিতেছি আপনি আমায় আপনার পবিত্র হৃদয় হইতে বিদায় দিয়া আপনার নির্ম্মল হৃদয়ে শান্তি স্থাপিত করুন।”

অমৃতলাল যাতনাপূর্ণ মনের আবেগে স্নেহের একখানি হস্ত আপন হস্তে লইয়া শূন্য হৃদয়ে বলিয়া উঠিলেন “না, না, তাহা কখনই হইবে না! স্নেহ! আর আমায় অমন নির্দ্দয় কথা বলিও না, আমি তোমার পিতার চরণ ধরিয়া কাঁদিব, বিনয় করিয়া বলিব তাহা হইলে অবশ্যই এ অভাগার প্রতি তাঁহার দয়া হইবে।” স্নেহলতা ধীরে ধীরে আপন হস্ত খানি টানিয়া লইলেন। আবার ধীরে ধীরে সেই আরক্তিম গণ্ড বহিয়া দুই ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। স্নেহ

ধীরে ধীরে কম্পিত কণ্ঠে আবার কহিলেন, "অমৃত বাবু! এই পবিত্র ভাল বাসাতে পৃথিবীর এমন কিছু নাই যাহা আসধ্য হইয়া থাকে। আপনি এ জগতের ভালবাসা ত্যাগ করুন, সম্মুখে আমাদের জন্য অনন্ত কাল রহিয়াছে, সেই অনন্ত কালে কেহই আমাদের পবিত্র প্রেমে বিঘ্ন জন্মাইতে পারিবে না। আপনি জিতেন্দ্রিয় বীর, আমি ক্ষুদ্র বালিকা, আমি আর আপনাকে কি বলিব। আপনি ত আমার সুখের জন্য সকলি করিতে পারেন, তাই বলিতেছি ইহ জন্মের মত ভুলিয়া যান। যখন জানিব দাসীর ভাবনা আর আপনাকে ক্লেশ দিতেছে না, তখনই জানিবেন আমি এজগতে সুখী হইব। নিশ্চয় জানুন বাবা এ বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন।"

অমৃতলালের ধীর হৃদয় আজ ক্ষুদ্র বালিকার নিকট পরাস্ত হইল। তিনি অধীর হইয়া কহিলেন "ছিঃ স্নেহ অমন নির্দ্দয় কথা বলিয়া আর আমার অসহ্য যাতনা দিও না, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি জীবনে মরণে চিরদিন তোমায় হৃদয়ের দেবী করিয়া রাখিব। তুমি ভিন্ন আর কেহই এ হৃদয়ে স্থান পাইবে না। তুমিই যে এই দুঃখময় সংসারে আমার এক মাত্র আরাম, আরাম ব্যতীত তিষ্টিব কিরূপে?" অমৃতলাল হতজ্ঞান হইয়া এই সকল কথা বলিতেছেন

এমন সময়ে একটু অন্তর হইতে কে তাঁহাকে ডাকিল। তখন তাঁহার স্মরণ হইল যে আজ তিনি বাড়ী যাইবেন। তিনি স্নেহের প্রতি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "স্নেহ! বিদায় দাও। আশা করি তোমার পুনর্দ্দশনে সফলমনোরথ হইব, বিশেষ আবশ্যক না থাকিলে বাড়ী যাইতাম না।"

স্নেহ কি উত্তর দিবেন অমৃতলালের সকল কথা শুনিয়াছেন কি না সন্দেহ। তাঁহার মন অমতলালের অসামান্য নিষ্কলঙ্ক প্রেমে অভিভূত ছিল। ইতিমধ্যে হীরালাল উষাবতী সহ সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অমৃতলাল দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন। হীরালাল ঈষৎ হাস্য করিযা কহিলেন আজ আর ভাই তোমার বাড়ী যাওয়া হইল না। আজ এই খানেই থাক, কলিকাতা গিয়া বোধ হয় ট্রেন পাইবে না।"

অমৃত। "রাত্রি কত হইয়াছে?"

হীরালাল। "আটটা।"

অমৃত। "তবে নিশ্চয়ই পাইব আমার গাড়ী কি রাস্তায় আছে?"

হীরালাল। "আছে।"

অমৃত। ঈষৎ হাস্য করিয়া উষাবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন তবে আজ যাই।

উষাবতী হাস্য বদনে কহিলেন, "আমি তোমায় বিদায় দিবার কে? স্নেহের নিকট বিদায় লইয়া যাও?"

অমৃতলাল স্নেহের প্রতি সস্নেহদৃষ্টিতে কহিলেন "আজ যাই।" তৎপরে উষার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "আপনারা অনুগ্রহ করিয়া পত্রাদি লিখিবেন।"

উষা। "লিখিব, শীঘ্র আসিবে ত?"

অমৃতলাল। "শীঘ্রই আসিব" এই বলিয়া হীরালালের একখানি হস্ত আপন হস্তে লইয়া প্রস্থান করিলেন। কিয়ৎ দূর গিয়া অমৃতলাল পশ্চাৎ ফিরিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন স্নেহলতা লতার ন্যায় উষাবতীর গলদেশ ধারণ করিয়া তাঁহারই প্রতি অশ্রুপূর্ণ লোচনে চাহিয়া রহিয়াছেন। তিনি মনে মনে বলিলেন "স্নেহ! তোমার ন্যায় অমিয় মাখা চরিত্র কি ভূলোকে মিলে? আমি তোমার আশা ছাড়িব? জীবন থাকিতে নহে।"

স্নেহের নিকট হৃদয়টী রাখিয়া অমৃতলাল চলিয়া গেলেন। এই সময় পাঠক মহাশয়কে অমৃতলালের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। অমৃতলালের পিতা এক সময়ে একজন ধনবান লোক ছিলেন। ইহাঁর পৈত্রিক বাসস্থান কলিকাতার সন্নিকট বেলঘরিয়া নামক

গ্রামে। ইহাঁর পিতার নাম পশুপতি চক্রবর্ত্তী। চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে এই পৃথিবীর মনুষ্য না বলিলেও চলে। ইনি অতিশয় নিরীহ, শিষ্টাচারী লোক। ইহাঁকে নিতান্ত ভাল মানুষ পাইয়া দুষ্ট লোকে ইহাঁর প্রতি নানা প্রকার অত্যাচার আরম্ভ করিল এবং অল্প কালের মধ্যেই ইহাঁর ধন সম্পত্তি ঠকাইয়া লইল। এই প্রকারে তাঁহাকে ঠকাইয়াও দুরাচারেরা ক্ষান্ত হইল না। এই সাধু ভদ্র লোকের প্রতি নানারূপ অত্যাচার আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল।

পশুপতি মহাশয় এই দস্যুদিগের অত্যাচার আর কিছুতেই সহ্য করিতে পারিলেন না। অবশিষ্ট যাহা কিছু সম্পত্তি ছিল তাহা লইয়া সপরিবারে স্বদেশ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই একটী অল্পবয়স্ক বালক ও একটী এক বৎসরের কন্যা লইয়া সপরিবারে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। বালকটীকে সেই খানেই যত্ন পূর্ব্বক বিদ্যাভ্যাস করাইতে লাগিলেন। বালক অপরিসীম মেধা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে অতি সুন্দর শিক্ষা লাভ করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের মনে যৎপরোনাস্তি আনন্দ হইতে লাগিল। এবং কিছু দিন পরে বালককে উচ্চ শিক্ষা লাভার্থ মহানগরী কলিকাতায়

প্রেরণ করিলেন। বালক দিন দিন নানা শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে লাগিল ও নানা সৎগুণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া উঠিল। সেই বালকই আমাদের এই চতুর্ব্বিংশতিবর্ষবয়স্ক যুবা অমৃতলাল। অমৃতলাল ও হীরালাল এক বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন, এই হেতু ইহাঁদের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন বন্ধুতা জন্মে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পৈশাচিক ঘটনা।

যে সময়ের ঘটনা বর্ণিত হইতেছে, সে সময়ে বিন্ধ্যাচল পর্ব্বতের অতি ভয়ানক অবস্থা ছিল। সন্ধ্যার পর আর কেহই সেই হিংস্রভয়সঙ্কুল পাহাড়ে যাইতে পারিত না। একদা একটী যুবা একাগ্র মনে কোন বিষয় চিন্তা করিতে করিতে অশ্বারোহণে নগরাভিমুখে যাইতেছেন। কিছুতেই তাঁহার দৃষ্টি নাই। সহসা তাঁহার কর্ণে একটী শব্দ প্রবেশ করিল, বোধ হইল কে যেন করুণস্বরে রোদন করিতেছে। রোদন রমণীকণ্ঠ নিঃসৃত বলিয়া বোধ হইল। যুবক আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। রজনীযোগে এই ভয়ানক স্থানে রমণীর রোদন শব্দ শুনিয়া কোন্ সাহসী হৃদয়বান যুবা স্থির

থাকিতে পারেন? যুবক শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইলেন; যতই নিকটে যাইতে লাগিলেন ততই সেই হৃদয়ভেদী ক্রন্দন স্পষ্টরূপে তাহার কর্ণে প্রবেশ করিতে লাগিল। যুবা এখন বেগে অশ্ব চালাইতে লাগিলেন। সম্মুখস্থ কোন বস্তুর প্রতি তাঁহার ভ্রুক্ষেপ নাই। গাত্রাবরণী ভেদ করিয়া অজস্রধারে ঘর্ম্ম নির্গত হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে পতিত হইতেছে, কিন্তু কিছু-তেই তিনি ক্লান্তি বোধ করিতেছেন না। সম্মুখস্থ বৃক্ষ, লতা প্রভৃতি কোন প্রকার বস্তুতেই তাঁহার গম-নের বাধা জন্মাইতে পারিতেছে না। অল্পক্ষণ মধ্যেই যুবা নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া পৌঁছিলেন। তথায় যে ভয়ানক দৃশ্য দেখিলেন তাহাতে তাঁহার সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। তিনি দেখিলেন যে এক ভীষণাকার সন্ন্যাসী-বেশধারী একটী মনুষ্য ভয়বিহ্বলা সুন্দরী বালিকার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক লইয়া যাইতেছে। অবলা বালিকা কাঁদিতে কাঁদিতে উক্ত পিশাচের পদতলে পতিত হইয়া বিনতি করিয়া কহিতেছে "ওগো আমায় কোথায় লইয়া যাও? আমার বাবা, মা আমায় না দেখিয়া কতই কাঁদিতেছেন। তোমার পায়ে পড়ি আমায় বাড়ী দিয়া আইস"। হায়! কে তাঁহার এই প্রাণ-স্পর্শী হৃদয়ভেদী কথা শুনিবে! নরাধম তাহার

কথায় কর্ণপাতও করিল না। নানা প্রকার কুবাক্যে কহিল, "কাঁদিস না চুপ কর্, তোরে এমন স্থানে বিক্রয় করিব যে তুই রাজরাণীর মত থাকিবি। দুঃখীর মেয়ে চিরদিন দুঃখ পাইবি তাই কি ভাল? কেন কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক লইয়া যাইব আপনা হইতে চল"। বালিকা নরাধমের এই ঘৃণিত বাক্যে অধিকতর চিৎকার করিয়া রোদন করিতে লাগিল। তাহার সেই সকরুণ রোদনধ্বনি নৈশ গগনভেদ করিয়া উঠিতে লাগিল। এই হৃদয়বিদারক ব্যাপার যুবকের আর সহ্য হইল না। তিনি অশ্ব হইতে অবতরণ ও নিকটস্থ বৃক্ষে অশ্ব বন্ধন পূর্ব্বক পাষণ্ড সতর্ক হইতে না হইতে তাহার মস্তকে হস্তস্থিত যষ্টি সজোরে প্রহার করিলেন। পামর অতিশয় ব্যথিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল। দুরাচারকে ভূতলশায়ী করিযাই যুবক সত্বর তাহার বক্ষে আরোহণ করিলেন। যুবক নরাধমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অপরিসীম আনন্দ অনুভব করিলেন। তাঁহার আনন্দের কারণ আর কিছুই নহে কেবল একটী অসহায়া বালিকাকে ভয়ঙ্কর বিপদরাশি হইতে উদ্ধার। বালিকাটী এখনও অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় থর থর কাঁপিতেছে! যুবক দেখিলেন বালিকাটী অসামান্য সুন্দরী। এমন সরলতাময়ী সুন্দর মূর্ত্তি তিনি আর কখন দেখেন নাই।

তিনি বিমুগ্ধচিত্তে ভাবিলেন এ মূর্ত্তি দেবী, না মানবী? এই অরণ্যপূর্ণ ভূখণ্ডে এ মূর্ত্তি যেন বনদেবী বলিয়া প্রতীতি হইতেছে। তৎপরে তিনি অভয়পূর্ণ বচনে কহিলেন "এখন আর ভয় কি, দুরাচার এখন সম্পূর্ণ আমার হস্তাধীন হইয়াছে, আপনার পরিচয় দানে বাধিত করুন। নির্ব্বিঘ্নে আপনাকে আপনার গৃহে রাখিয়া আসি"।

ঐ সময় সেই ভীষণাকার পিশাচ নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করিতেছিল। যুবক দুষ্টের প্রতি সকোপ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "দুর্ব্বৃত্ত নরাধম স্থির থাক্ নতুবা তোর জঘন্য জীবন বিনাশ করিয়া পৃথিবীর পাপভার লাঘব করিব"। এই বলিয়া তাঁহার উত্তরীয় দ্বারা নিকটস্থ বৃক্ষের সহিত উহাকে বাঁধিলেন ও তৎপরে বন্ধন মোচনাশঙ্কায় নিকটস্থ অরণ্য হইতে কতকগুলি কঠিন লতা আনিয়া পুনর্ব্বার দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলেন।

বালিকা ঐ সময় যুবকের মনোহর মূর্ত্তি অনিমিষ নয়নে দেখিতেছিলেন, এবং তাঁহার নিঃস্বার্থ পরোপকারিতা স্মরণ করিয়া গদগদ চিত্তে চিত্র পুত্তলিকাবৎ স্থির হইয়া সেইখানে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইত্যবসরে যুবক বন্ধন শেষ করিয়া প্রফুল্ল অন্তরে রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, অমনি রমণীর

সুচারু বদনখানি লজ্জায় অবনত হইল। যুবক রমণীর পরিচয় ও এতৎ ঘটনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। বালিকা লজ্জাযুক্ত কম্পিত কণ্ঠে কহিলেন "আমি, আমার মাতা আরও কতকগুলি আমাদের প্রতিবেশী পুরুষ ও রমণী আমরা এই পর্ব্বতে বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা দিতে আসিয়াছিলাম। আমরা নানা স্থানে দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতেছিলাম। আমি কএক জন প্রতিবেশিনীর সঙ্গে যোগমায়া দেবীর প্রতিমূর্ত্তি দেখিতে গিয়াছিলাম। আমি একাগ্রমনে দেবীর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিতেছি, কিছুক্ষণ পরে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি আমার সঙ্গিনীরা সেই স্থানে নাই, এই সন্ন্যাসী আমার পশ্চাৎ দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, ইহাকে দেখিয়া আমার প্রাণে অধিকতর ভয়ের সঞ্চার হইল। তৎপরে এই সন্ন্যাসী আমায় কহিল, সঙ্গিনীদের খুঁজিতেছ? তাহারা ত তোমায় ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। আমার সঙ্গে আইস, আমি তাহাদের নিকট তোমায় দিয়া আসি"। আমি তখন কি করিব ভয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে ইহার সঙ্গে চলিলাম। এই কথা বলিতে বলিতে বালিকার প্রেমমাখা নয়নদুটী অশ্রুপূরিত হইল।

যুবক রোষকটাক্ষে সেই দস্যুর প্রতি চাহিয়া কহিলেন "নরাধম, ঘৃণিত কুৎসিত কাজ সাধিবার কি

অন্য বেশ নাই? রে সন্ন্যাসীবেশধারী পশু ধিক্ তোরে। ধন্য ভগবানের করুণা যে তোর মত নরাধম কপট দুরাচারীকেও তাঁহার এই মনোহর পৃথিবীতে স্থান দিয়া নিত্য প্রয়োজনীয় প্রদানে কুণ্ঠিত হইতেছেন না"। বালিকা অবনতমুখী হইয়া যুবকের এই মধুর তিরস্কার শুনিতেছিল। যুবক পুনর্ব্বার সেই সরলতাময়ী বালিকার প্রতি দৃষ্টি করিয়া মধুব স্বরে কহিলেন, তার পর দুর্ব্বৃত্ত কি করিল?

বালিকা। "তার পর নানা প্রকার কদর্য্য স্থান দিয়া এইখানে আনিল। আমি শেষে বুঝিতে পারিলাম, কোন প্রকার মন্দ অভিসন্ধিতে আমায় লইয়া যাইতেছে। ক্রমে সন্ধ্যা হইতে লাগিল। আমার শরীর ক্রমে অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। আমি কষ্টে ও ভয়ে কাঁদিতে লাগিলাম। পরে দুরাচার ক্রমে ক্রমে তাহার গূঢ় অভিসন্ধি ব্যক্ত করিল ও আমায় টানিতে টানিতে লইয়া চলিল। আমি হতাশ হইয়া চিৎকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। তৎপরের ঘটনা আপনি আসিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন"।

যুবক। "বলুন, কোন স্থানে আপনাকে রাখিয়া আসিব? আপনার বাড়ী কোথায়? ক্রমে অধিক রাত্রি হইয়া আসিল শীঘ্র বলুন"।

বালিকা। "আমাদের বাড়ী মৃজাপুর"।

যুবক। "মৃজাপুর? আপনার পিতার নাম কি''?

বালিকা। "আমার পিতার নাম পশুপতি চক্রবর্ত্তী।"

যুবক। "সবিস্ময়ে কহিলেন তবে ত আমি তাঁহাকে বিশেষ জানি, আপনি তাঁহারই কন্যা? আপনাদের বাড়ীতে অনেক দিন গিযাছি, কৈ আপনাকে ত কখন দেখি নাই। অমৃত বাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুতা আছে"।

পাঠক মহাশয় হয তো এখন এই বলিকাকে চিনিতে পারিয়াছেন। ইনি আমাদের পূর্ব্বপরিচিত অমৃতলালের ভগিনী, এখন ইহার বযস চতুর্দ্দশের কিছু অধিক হইযাছে।

যুবক পুনর্ব্বার কহিলেন "তবে আর বিলম্বের প্রযোজন কি? চলুন আপনাকে আপনার পিতা মাতার কাছে রাখিয়া আসি। বোধ হয় তাঁহারা আপনার জন্য কত ভাবিতেছেন।"

যুবক আপনার অশ্বের বল্গা ধরিযা ধীরে ধীরে পদব্রজে অগ্রসর হইলেন। বালিকা তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাঁহাদের এই রূপে গমন করিতে দেখিযা সেই ভীষণাকার মনুষ্যরূপী পিশাচ ব্যাকুল ভাবে কহিল, "আমাব বন্ধন খুলিয়া দিন্, আমার

অপরাধ ক্ষমা করুন আমি আর কখন এমন কাজ করিব না"। যুবক মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, তোর মত নরাধমকে মনুষ্য কখন ক্ষমা করিতে পারে না। দয়াময় ঈশ্বরের নিকট ব্যাকুলভাবে ক্ষমা প্রার্থনা কর, তাঁহারই করুণাবলে তুই মুক্ত হইবি"।

বালিকা যুবকের প্রতি করুণস্বরে কহিলেন "ওকে অমন করিয়া বাঁধিয়া রাখিলেন, যদি বাঘে খায়"? যুবক বালিকার ভাব দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিলেন এ "দেবী ? না, মানবী"? তৎপরে যুবক মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, "এই দুষ্ট মুক্ত হইলে আমাদের কি নির্ব্বিঘ্নে যাইতে দিবে ? কল্য আসিয়া উহাকে মুক্ত করিব"।

এই রূপ কথপোকথনে তাঁহারা সেই ভয়ানক পর্ব্বত ছাড়াইয়া রাজ-পথে আসিযা পড়িলেন। যুবক ঊর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া দেখিলেন রজনীর শিরোভূষণ চন্দ্রমা মধ্যাকাশে উজ্জ্বল রূপে প্রকাশ পাইতেছে। বুঝিলেন, রজনী দ্বিতীয় প্রহর।

পাঠক মহাশয় হয় তো এই যুবককে চিনিতে পারেন নাই। ইনি আমাদের রামদাস মহাশয়ের দৌহিত্র, মৃতা হরসুন্দরীর পুত্র, ইহার নাম সুশীল কুমার। ইনি এখন দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পরম সুন্দর যুবা। অদ্য কোন একটী বিশেষ কারণবশত এই

জনহীন সঙ্কটাপন্ন স্থান দিয়া একাকী গমন করিতে-ছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মিলন।

মৃজাপুর নিঃস্তব্ধ। সকলেই নিদ্রার মোহিনী মায়ায় অভিভূত হইয়া নিদ্রা দেবীর ক্রোড়ে বিশ্রাম সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। কেবল এক একবার সেই গভীর নিঃস্তব্ধতা ভেদ করিয়া শান্তিরক্ষকদিগের উচ্চ চিৎকার ধ্বনি হইতেছে। এক একটী কুকুর উচ্চ শব্দ করিয়া এদিক্ ওদিক্ বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। ঝিল্লিকাকুল ঝিল্লীরব করিতেছে। এক একটী পেচক উচ্চ শব্দ করিয়া মনের আনন্দে যেন কাহাকে ডাকিতে ডাকিতে বিস্তৃত আকাশে বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। শুভ্র চন্দ্রকিরণ পতিত হইয়া রজত রঞ্জনে প্রাণ মন মুগ্ধ করিতেছে। সুশীতল বায়ু প্রবাহিত হইয়া সমুদয় জগতকে শীতল করিতেছে। পৃথিবী শোভার ভাণ্ডার যে দিকে চাও অতুল শোভা, কিন্তু এ শোভায় মোহিত কয় জন? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ

প্রাণী সমুদয় মনুষ্যইত নিদ্রা দেবীর ক্রোড়ে অচেতন আছে। কতগুলি লোক নিদ্রাকে পরাভব করিয়া আপনাকে সচেতন রাখিয়াছে। সে কাহারা? রোগী শোকী, পাপী, আরও আছে, বিরহী, প্রণয়ী। রোগী আপন রোগযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছে। তাহার নিকট জগতের এশোভা অপ্রকাশিত। শোকী আপন শোকানলে দগ্ধ হইয়া হা হা করিতেছে। তাহার নিকটেও এ শোভা অপ্রকাশিত। পাপী আপনার পাপচিন্তায়, পাপকার্য্যে ব্যতিব্যস্ত, তাহার নিকটও এশোভা অপ্রকাশিত। বিরহী বাঞ্ছিত ধনের কামনায় আত্মবিস্মৃত হইয়া অনিদ্রিত সুতরাং তাহার নিকটও এই মনোরম শোভা অপ্রকাশিত। প্রণয়ী প্রণয়িনী আপন সুখের স্বপ্নে বিভোর তাহাদের নিকটও এশোভা অপ্রকাশিত। এ অতুল শোভা আপনাতে আপনি বিমুগ্ধ হইয়া আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইবে।

এইরূপ নিস্তব্ধতার মধ্যে একটী কুটীরে দ্বীপ জ্বলিতেছে। বাড়ীটি যদিও ছোট কিন্তু গৃহস্বামীর যত্নে অতিশয় পরিস্কার। সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একটী ক্ষুদ্র মনোহর পুষ্পোদ্যান। পরিস্কার চন্দ্রকিরণ পতিত হওয়ায় ক্ষুদ্র বাড়ী খানি যেন হাসিতেছে। গৃহ মধ্যে একটী প্রকোষ্ঠে দুটী লোক বসিয়া কথপোকথন করিতেছেন। কক্ষটীর কবাট ভিতর হইতে

বদ্ধ, গবাক্ষ দিয়া দীপশিখা নির্গত হইতেছে। কক্ষস্থ দুটী লোকের মধ্যে একটী পুরুষ অপরা রমণী। পুরুষের বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ হইবে। স্ত্রীলোকটীর বয়স চল্লিশ বেয়াল্লিশ। পুরুষ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন “আমি আর কি করিব বল? সাধ্যানুসারে খুঁজিতেও আর ত্রুটী করিলাম না। ভগবানের মনে যাহা আছে তাহাই হইবে। আর এই এত রাত্রি কোথায় বা যাই বল। হরি ও তাহার মাতা ত সেই অবধি খুঁজিতেছে। আমি আর কোথায় যাইব? চক্ষেও এখন অল্প দেখি।

স্ত্রীলোকটী কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, তুমি আর কোথায় যাইবে? ভগবান আমার কপালে যাহা লিখিয়াছেন তাহাই হইবে। গুরুদেব! তুমিই ভরসা। আমার অমৃত আসিলে আমি কি বলিয়া বাছাকে প্রবোধ দিব? তার যে মোহিনী অন্ত প্রাণ। রমণী আর বলিতে পারিলেন না। তাঁহার কণ্ঠ অবরোধ হইয়া আসিল। তিনি ব্যাকুল ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। বৃদ্ধ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন সম্পত্তি খোয়াইলাম, দেশত্যাগী হইলাম, মনে করিলাম এইবার বিদেশে আসিলাম, সুখী হইব। অমৃত বাঁচিলে আমার কিসের অভাব? ও আর সহ্য হয় না, হরিহে! তুমিই ভরসা।”

রমণী। "বাছা মোহিনী আমার কখন কষ্টের মুখ দেখে নাই, বাছা বাপ, মা, ভাই ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না। আহা! বাছা আমার কতই কাঁদিতেছে। মা! বিন্ধ্যবাসিনী তোমার কাছেই আমার স্নেহের ধনকে রাখিয়া আসিয়াছি। দেখ মা! আমার গচ্ছিত ধন যেন হারায় না।"

এই সময় বোধ হইল বাহির হইতে তাঁহাদের কবাটে কে যেন আঘাত করিল। রমণী ব্যাকুলতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে 'ও হরির মা?' রমণী দ্রুত পদবিক্ষেপে দরজা খুলিতে খুলিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি কে?" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া যেমন দরজা খুলিলেন, অমনি তাঁহার হারাধন মোহিনী ক্ষুদ্র হস্ত দুখানি দ্বারা তাঁহার গলদেশ বেষ্টন করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহার হারারত্ন মোহিনীকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া হৃদয়ে চাপিয়া অবিরল আনন্দাশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এই ভাবের পর মোহিনী কহিল বাবা ইনিই আমাকে ভয়ানক বিপদ হইতে মুক্ত করিয়া তোমাদের নিকট আনিয়াছেন।"

পশুপতি মহাশয় সুশীল কুমারকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন এবং আনন্দে গদগদ হইয়া কহিলেন, "কে-ও আমাদের সুশীল কুমার না? "বাবা সুশীল

এতক্ষণ অন্যমনস্কতা বশত তোমায় দেখিতে পাই নাই, কিছু মনে করিয়াছ কি বাবা ?” সুশীল কুমার বিনীত ভাবে কহিলেন, সে জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না। ইহাতে আর কি মনে করিব ? তৎপরে ব্রাহ্মণ তাঁহার স্ত্রীকে কহিলেন, তুমি ইহাকে চিনিতে পার নাই, ইনি আমাদেব বরাহ নগরের রামদাস মহাশয়ের দৌহিত্র। সেই একবার হীরালাল বাবু ও ইনি আমার অমৃতের সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহাঁরা আমার অমৃতের সঙ্গে এক স্কুলে পড়েন। আমার অমৃতকে বড়ই যত্ন করেন। “বাবা সুশীল ! আমাব কাছে আসিযা বোস। এখানে কি মনে করিয়া কবে আসা হইয়াছে ?

সুশীল। “আজ্ঞা এখানে কাজ করিবার ইচ্ছা আছে ? তাই আসিয়াছিলাম। আজ চার পাঁচ দিন হইল আসিযাছি।

পশুপতি। “তা বেশ বাপু। এই খানেই কাজেব সুবিধা করিযা লও, তোমাদের পাঁচ জনকে দেখিলেও সুখে থাকিব।”

সুশীল। “আজ্ঞা তবে এখন আসি, বাত্রি অনেক হইয়াছে।”

পশুপতি। “আজ বাবা, এই খানেই থাক রাত্রি অনেক হইয়াছে। আজ তুমি আমায় যে

উপকার করিয়াছ তা আর বলিযা কি জানাইব? আশীর্ব্বাদ করি ভগবান তোমাকে দীর্ঘজীবি করুন ও সুখে রাখুন। আজ বাপু এখানেই থাকিতে হইবে।”

সুশীল কুমার কি বলিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, মোহিনীকে যতটুকু দেখি সেই সময়টুকুই পরম সুখের। সেই সুখটুকু কোন মতেই তিনি ত্যাগ করিতে পারিলেন না। সুশীলকুমার মোহিনীর প্রফুল্ল মুখখানির প্রতি একবার চাহিয়া দেখিলেন। মোহিনী যেন তাঁহারই উত্তরের প্রতীক্ষায় তাঁহার প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। সুশীল কুমারের হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইল। তিনি সবিনয়ে কহিলেন আচ্ছা আজ এইখানেই রহিলাম।

অনন্তর বৃদ্ধ মোহিনীর নির্ম্মল মুখচন্দ্রের প্রতি চাহিযা কহিলেন “বল দেখি মা! কি হইয়াছিল, তুই বৃদ্ধ মা, বাপকে কাঁদাইয়া কোথায় গিয়াছিলি” ? মোহিনী এক এক করিয়া সমুদয় ঘটনা বলিলেন। তাঁহারা সেই ভযানক ঘটনাবলী শুনিয়া যার পর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

বৃদ্ধ কহিলেন “মা ভগবানকে ধন্যবাদ দাও তিনি এই সাধু পুরুষ দ্বারা তোমায় রক্ষা করিয়াছেন”।

নানা প্রকার কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা আহার করিয়া শয়ন করিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

এ রমণী কে?

মৃজাপুরের একটী সুন্দর অট্টালিকার একটী প্রকোষ্ঠ মধ্যে দুইটী যুবক কথোপকথন করিতেছেন। নিকটে একটি ভৃত্য একখানি তালবৃন্ত হস্তে তাঁহাদিগকে ব্যজন করিতেছে। ভাদ্র মাস ভয়ানক গ্রীষ্ম, বেলা ৪টা বাজিয়া গিয়াছে তথাচ দিনকরের প্রখর উত্তাপ কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। যুবকদ্বয়ের সুন্দর মুখ বার বার ঘর্ম্মসিক্ত হইয়া সলিলসিক্ত কমলের ন্যায় বোধ হইতেছে। সুগন্ধিযুক্ত রুমালের দ্বারা মধ্যে মধ্যে তাহা বিদূরিত করিতেছেন। একটি যুবা কহিলেন "তোমার এ স্থান পছন্দ হইতেছে না কেন"?

দ্বিতীয় যুবা কহিলেন 'দেশ হইতে বড় বেশী দূর, আর বড় গ্রীষ্ম, আমার বোধ হয় এই অঞ্চলে অন্য কোন স্থান হইলে আমার সুবিধা হইবে"।

প্রথম যুবা "এইখানেই তোমার বেশ সুবিধা

হইবে কারণ এখানে উকীল খুব অল্প। আমার এই দুই বৎসর এখানে আসিয়া যে রূপ সুবিধা হইয়াছে আমি বোধ করি অন্য স্থানে ছয় বৎসরেও এইরূপ হইত না। আর এখানকার জল বায়ু অতি উৎকৃষ্ট, আমার শরীর এখানে খুব ভাল আছে"।

দ্বিতীয় যুবা। "দেখি কি করি, আমার এইখানে একটি বন্ধু আছেন, তিনি কলিকাতায়ই প্রায় থাকেন। বোধ হয় তিনি এখানে আসিয়াছেন তাঁহাদের বাড়ী আমি দুইবার আসিয়াছিলাম। তাঁহার সহিত একবার পরামর্শ করিবার ইচ্ছা আছে"।

প্রথম যুবা। "তুমি যে অমৃত বাবুর কথা বলিযাছিলে তিনিই না কি"?

দ্বিতীয় যুবা। "হা তিনিই"।

প্রথম যুবা। "আমি তোমার নিকট তাঁহার অনেক প্রশংসা শুনিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব মনে করি কিন্তু এই দুই বৎসর আছি দেখা আর হয না। এই শুনি তিনি আছেন আবার শুনি চলিয়া গিযাছেন। এবার আসিলে নিশ্চযই দেখা করিব"।

দ্বিতীয় যুবা। "আমার সঙ্গেই যাইও তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করিলে খুব সন্তুষ্ট হইবেন"।

যুবকদ্বয়ের এইরূপ নানা প্রকার কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় একজন বৃদ্ধ যোগী আসিয়া

একটি যুবাকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন "তোমার নাম কি সুশীল কুমার ?

সুশীল কুমার দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, "আজ্ঞা হাঁ"।

যোগী স্থূলাকার কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, চক্ষু ক্ষুদ্র অতি উজ্জ্বল, নাসিকা দীর্ঘ ও অন্যান্য মুখাবয়ব সুন্দর। বক্ষ বিশাল তাহাতে যজ্ঞসূত্র দুলিতেছে, দর্শন মাত্র বোধ হয় অনেক দিনাবধি পবিত্র যোগালম্বন করিয়াছেন। তাঁহার পক্ক কেশজাল জড়িত রূপে লম্বিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে পতিত হইয়াছে। ভস্মাচ্ছাদিত. শরীর ধূসরবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। বয়স অনুমান ষাইট বৎসর হইবে। এত বয়স হইযাছে তথাচ বোধ হয় তাঁহার অসামান্য শক্তির কিছুমাত্র হ্রাস হয নাই। তাঁহার সেই তেজোময কান্তি দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয।

যোগী গম্ভীর স্বরে সুশীল কুমারকে কহিলেন "তোমাকে আমার কোন বিশেষ আবশ্যক আছে আমার সঙ্গে আইস"।

সুশীল কুমার কিছুমাত্র দ্বিরুক্তি না করিয়া কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আপন উত্তরীয় ও যষ্টি লইয়া তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। সন্ন্যাসী রাজপথ অতিক্রম করিযা অত্যুচ্চ বিন্ধ্যগিরি

আরোহণ করিতে লাগিলেন। পর্ব্বতের নিম্নে গঙ্গার একটী শাখা প্রবাহিত হইতেছে। জল অতি নির্ম্মল তক্ তক্ করিতেছে। ভাগীরথীর অপর তীরে একটী সুবিস্তীর্ণ মাঠ। তাঁহারা যে পথ দিয়া উঠিতেছিলেন তাহার দুই পার্শ্বে নানাবিধ বন্য ফুলের গাছ, সুগন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিতেছে। অপর এক পার্শ্বে একটী ঝরণা, তাহা হইতে ঝর ঝর শব্দে জল নির্গত হইয়া মধুর ধ্বনি উৎপন্ন করিতেছে।

সুশীলকুমার এই রূপ প্রকৃতির অত্যাশ্চর্য্য শোভা বিমুগ্ধ চিত্তে দর্শন করিতে করিতে যাইতেছেন। পর্ব্বতোপরি মধ্যে মধ্যে পাণ্ডাদের ঘর। তাঁহারা এই সব পশ্চাতে ফেলিয়া ক্রমান্বয়ে উঠিতে লাগিলেন। এই প্রকারে বহুদূর যাইয়া কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিষ্কার পবিত্র আশ্রম সুশীলকুমারের দৃষ্টিগোচর হইল। তৎপরে যোগীবর কহিলেন "আর তোমায় অধিক দূর যাইতে হইবে না, সম্মুখেই আশ্রম দেখা যাইতেছে"। এই রূপ বলিতে বলিতে তাঁহারা এক খানি পরিচ্ছন্ন কুটীরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসী কুটীরদ্বার হইতে ডাকিলেন "মা সরোজ! অতিথিকে আসন প্রদান কর"। কুটীর মধ্য হইতে একটি যোগিনী ব্যস্ত সমস্ত হইয়া দুইখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুশাসন তাঁহাদের উভয়কে প্রদান করিলেন।

যোগিনীর পরিধান গেরুয়া বস্ত্র, গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা দোলায়মান। হস্তে রুদ্রাক্ষের বলয়। তাঁহার আলুলায়িত রুক্ষ জড়িত কেশরাশি চরণ চুম্বন করিতেছে। যোগিনীর বয়ঃক্রম অনুমান ত্রিশ বৎসর হইবে। সুশীলকুমার দেখিলেন যোগিনী অনিমিষ-নেত্রে তাঁহারই প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন। সুশীল-কুমার বিস্মিত হইলেন, কারণ সে রূপ স্নেহমাখা দৃষ্টি তিনি আর কখনও দেখেন নাই। তাঁহার মনে হইল যেন যোগিনী তাঁহাকে দেখিয়া কোন দুর্দ্দমনীয় মনো-বৃত্তি গোপন করিতেছেন। যোগিনী সুশীলকুমারকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। সুশীলকুমার তাঁহার জিজ্ঞাসিত বিষয় শুনিয়া কিছু আশ্চর্য্য বোধ করিতে লাগিলেন, কারণ যোগিনী সমস্তই তাঁহাদের সাংসারিক বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, যথা তাঁহার পিতা জীবিত আছেন কি না? তিনি কোন কার্য্য করেন কি না? মৃজাপুরে তাঁহার থাকা হইবে কি না? ইত্যাদি ইত্যাদি।

এইরূপ কথোপকথনে সূর্য্য অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে পক্ষিকুল দিনকরের গমনে বিষণ্ণ হইয়া নিঃশব্দে নিজ নিজ কুলায়ে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। সরোজিনী স্বনাথের গমনে ম্রিয়মান হইল। যোগীগণ ঈশ্বর আরাধনার সময় উপস্থিত দেখিয়া আনন্দে পবিত্র

মনে ঈশ্বরগুণ গানে মত্ত হইলেন। স্নিগ্ধকর সন্ধ্যা সমীরণ প্রবাহিত হইয়া যোগীদিগকে ব্যজন করিতে লাগিল। সকলই এই পবিত্র অনুকুল সুসময়ে দেবাদিদেবের বাঞ্ছিত পবিত্র চরণ পূজা করিয়া কৃতার্থতা অনুভব করিতে লাগিলেন। চতুর্দ্দিকে বনকুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া সুগন্ধে ঋষিদিগকে পরিতৃপ্ত করত তাঁহাদের পবিত্র হৃদয় মাতাইয়া তুলিতে লাগিল। নানা প্রকাব বন্য পশু চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। গিরিবর অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল।

সুশীলকুমার নম্রতাসহকারে যোগীবরকে কহিলেন, "অনুমতি হয় তো এখন যাই"। যোগী কহিলেন, হাঁ রজনী সমাগত, চল তোমায় রাখিয়া আসি।

সুশীল। "আজ্ঞা আপনি আর কেন কষ্ট করিবেন? আমি আপনার প্রসাদে সচ্ছন্দে নগরে পৌঁছিতে পারিব"।

যোগা। "আচ্ছা যাও, আবশ্যক হইলে পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে"।

যোগিনী যোগীবরকে কহিলেন "বাবা। আমাদের গিরির অশ্বটি সুশীলকুমারকে দাও, গিরি আবার কল্য আনিবে"।

যোগীবর কহিলেন "উত্তম কথা গিরি কোথায় ? একটি অল্প বয়স্ক বালক আসিয়া উপস্থিত হইল। যোগীবর কহিলেন "গিরি তোমার অশ্বটি সজ্জিত করিয়া আনিয়া দেও, আবার কল্য আনিও"। বালক "যে আজ্ঞা" বলিযা অশ্বটি আনিয়া দিল। সুশীল-কুমার যোগী ও যোগিনীকে প্রণাম করিয়া অশ্বা-রোহণে প্রস্থান করিলেন।

সুশীলকুমার অতি আশ্চর্য্য মনে গমন করিতে লাগিলেন, কারণ যোগীবর তাঁহাকে যে বিশেষ আব-শ্যক আছে বলিযা আনিয়াছিলেন কৈ তাহাত কিছুই বলিলেন না। আর যোগীব আশ্রমে যে স্নেহময় রমণী মূর্ত্তি দেখিলেন সে রমণী কে ? তাঁহার প্রতি রমণীর এরূপ বাৎসল্যপূর্ণ দৃষ্টি কেন ? এ রূপ স্নেহ মাখা দৃষ্টি তিনি আর কখনও দেখেন নাই। এই সমস্ত অভূতপূর্ব্ব ঘটনা তিনি মনোমধ্যে আন্দোলন করিতে করিতে কিয়দ্দূর যাইয়া যে লোমহর্ষণ ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল তাহা তৃতীয় পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুখের স্বপ্ন।

সুশীলকুমার দক্ষিণস্থ একটি কক্ষে শয়ন করিয়াছিলেন। শয়ন করিয়াছিলেন মাত্র, আজ আর তাঁহার নিদ্রা নাই, নানা প্রকার চিন্তা জলস্রোতের ন্যায় ক্রমাগত তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতেছিল। পর্ব্বতে সেই রমণী কে? কি মনে করিয়া যোগী তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন? যোগিনীর তাঁর প্রতি এরূপ বাৎসল্য ভাব কেন? এই রূপ নানা বিষয় চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ সেই পর্ব্বতমধ্যে সেই ভীষণাকার পুরুষ, সেই ভয়চকিতা সুরসুন্দরী মোহিনীর তৎকালীন ভাব, তাঁহার সেই হৃদয়ভেদী ক্রন্দন, এই সমস্ত তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইয়া পূর্ব্বচিন্তা দূর করিল।

তিনি মোহিনীর মোহিতকারী চিন্তাতেই ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ভাবিলেন মোহিনী কি দেবী? তিনি কি আজ সেই দেবীকে অসীম সাহসে রক্ষা করিয়াছেন, এই সমস্ত ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইতে লাগিল। মোহিনীর অপূর্ব্ব পবিত্রতা, অসামান্য সরলতা হৃদয়ে উদিত হইল। তিনি ভাবিলেন

মোহিনী রমণীকুলের রত্ন, মোহিনী এই সংসার-অরণ্যের কমল, মোহিনী এই পৃথিবীতে দেববালা। একাধারে এতগুণ এত পবিত্রতা তিনি কখন দেখেন নাই। তিনি মোহিনীর সমুদায়ই অসাধারণ দেখিতে লাগিলেন। এই প্রকার মোহিনীর আনন্দময় বিষয় সকল চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল, কিন্তু নিদ্রাতেও তিনি মোহিনীসংক্রান্ত সুখময় চিন্তা হইতে অপসৃত হইতে পারিলেন না। নিদ্রাবস্থায় সুশীলকুমার মোহিনীসংক্রান্ত নানা সুখময় স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। এমন সময় অকস্মাৎ বালিকাকণ্ঠবিনিঃসৃত অমৃতময সঙ্গীতধ্বনি তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি মনে করিলেন পার্শ্বস্থ গৃহে এই সুধাময় সঙ্গীত হইতেছে। ক্রমে সেই সুধাময় সঙ্গীত উষাব সমীরণের সহিত সেই নির্জ্জন কুটীর ভেদ করিয়া সুশীলকুমারকে বিমোহিত করত গগনে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। সুশীল কুমার বিমুগ্ধ চিত্তে সেই অপ্সরাকণ্ঠবিনিঃসৃত সুধাময় সঙ্গীত শুনিতে লাগিলেন ও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? স্বপ্নই হইবে, নতুবা এ সুরবালাকণ্ঠ নিঃসৃত গীত এই পৃথিবীতে কোথা হইতে শুনিব? বাস্তবিক এরূপ উচ্চ অথচ মধুরতাপূর্ণ সঙ্গীত তিনি আর কখন শুনেন নাই।

ক্রমে সেই সুধামাখা সঙ্গীত নিঃস্তব্ধ হইল। সুশীল কুমার ভাবিলেন মানবীর কি এইরূপ কণ্ঠ সম্ভবে? তবে এ বালিকা কে? এগীত কি আমার মোহিনীর হইবে? "আমার মোহিনী" বলিয়াই তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। মোহিনী আমার? শিমুল বৃক্ষে কি কখন পারিজাত ফুটে? আমি এমন কি তপস্যা করিয়াছি যে নারীকুলের দুর্লভ দেবকুমারী; সুরসুন্দরী, মোহিনী আমার হইবে? যে সৌভাগ্যবান পুরুষের হস্তে মোহিনীর চারু হস্ত সমর্পিত হইবে তাঁহারই জীবন সার্থক। তিনিই এই দুঃখময় সংসারে সুখী। এইরূপ মোহিনীর বিষয় সকল চিন্তা করিতে করিতে নয়ন উন্মীলন করিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন সম্মুখস্থ বাতায়নে একটী মনোহর পদ্ম প্রস্ফুটিত হইয়াছে। তিনি যেমন সেই কমলটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন অমনি মোহিনীর চারু বদনখানি সেস্থান হইতে অপসৃত হইল। মোহিনী শযন করিয়া নিদ্রা দেবীর অনেক ধ্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সুশীলকুমার তাঁহাব হৃদয অধিকাব করিযাছিলেন। শুভক্ষণে সুশীলকুমাব তাঁহাকে সেই সঙ্কটাপন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিযাছিলেন, সেই অবধি তিনি সুশীলকুমারকে আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন। মোহি-নীর সরল হৃদয় ইতিপূর্ব্বে আর কেহই অধিকার

করিতে পারে নাই। তিনি অনেক সুন্দর যুবা দেখিয়াছেন কিন্তু কেহই তাঁহার পবিত্র চিত্তের এপ্রকারের প্রেম পায় নাই। তৎপরিবর্ত্তে অন্য যুবা দেখিলে বালিকার কেমন একটা ভীতির সঞ্চার হইত পশুপতি মহাশয় কোন দিন তাঁহাব বিবাহেব প্রস্তাব তুলিলে তিনি নির্জ্জনে গিয়া কাঁদিতেন, কিন্তু তাঁহার সেই পবিত্র সরল হৃদয সুশীলকুমারকে দেখিযা যে কেন বিচলিত হইল তাহা তিনি নিজেই অনুভব করিতে সক্ষম হইলেন না। সুশীলকুমারের সৌন্দর্য্য অতীব মনোহব বলিযা কি তিনি ভুলিতে পারিতেছিলেন না? না, তাহা নহে, কারণ তদপেক্ষাও সুন্দর তিনি দেখিয়াছেন কিন্তু সুশীল কুমারেব বদন মধ্যে যে একটী অত্যাশ্চর্য্য ঐশ্বরিক ভাব আছে তাহার দ্বিতীয তুলনা মিলা ভাব। বোধ হয় এই কাবণেই বালিকা অপ্রার্থিত জনে হৃদয দান করিয়াছেন।

কতক্ষণে সুশীল কুমারের নিদ্রাভঙ্গ হইবে, কতক্ষণে তাঁহার মৃদু হাস্যের সহিত বিনয়পূর্ণ কথাগুলি শুনিযা আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন এই সকল চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার আব সে রাত্রে নিদ্রা আসিল না। তিনি শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঠিয়া দেখিলেন উষার স্নিগ্ধকর মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে। পূর্ব্বদিক শুভ্রবর্ণ ধারণ করিযাছে, একটী

একটী পাখী ডাকিতেছে, এক্ষণে নিদ্রা আসা অসম্ভব জ্ঞানে তিনি আর শয়ন করিলেন না। হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া পালঙ্কোপরি উপবেশন পূর্ব্বক লোহিত বর্ণের পা দুখানি দুলাইতে দুলাইতে একটী গীত গাহিতে লাগিলেন। সেই অমীয়মাখা গীত ধ্বনি সুশীলকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছিল। মোহিনী সঙ্গীত শেষ করিয়া চতুর্দ্দিকে পদচারণা করিতে করিতে সুশীলকুমার যে গৃহে শয়ন করিয়াছিলেন সেই গৃহের সম্মুখস্থ গবাক্ষ দিয়া তাঁহার মনোহর রূপরাশি দেখিয়া নয়নকে চরিতার্থ করিতেছিলেন এমন সময় সুশীলকুমার নয়ন উন্মীলন করিযা দেখিলেন মোহিনীর আকর্ণ নয়নদ্বয় তাঁহারই প্রতি সংলগ্ন রহিয়াছে। যেমন তিনি সেই নয়নদ্বয়ে আপন নয়ন সম্মিলিত করিবেন অমনি মোহিনীর সেই মনোহর মূর্ত্তি অদৃশ্য হইল। সুশীলকুমারের হৃদয় কেমন যেন একটা অপরিসীম আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি ভাবিলেন এ কি মোহিনী? এখন এখানে কেন? তবে কি তিনিও যেমন মোহিনীকে সর্ব্বদা দেখিতে অভিলাষ করেন মোহিনীও সেই রূপ তাঁহাকে দেখিতে অভিলাষিণী? মোহিনীর আনন্দময় বদনে আনন্দ ভাসিতেছিল। সুশীলকুমার মোহিনীর সেই প্রফুল্ল বদনখানির

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে শয্যা ত্যাগ করিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া পশুপতি মহাশয়ের নিকট বিদায় গ্রহণ করিতে গমন করিলেন। পশুপতি মহাশয় তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দ সহকারে কহিলেন "এবেলা বাবা এখানেই থাক"। সুশীলকুমার বিনীতভাবে কহিলেন "বিপিন বাবু আমার জন্য বোধ হয় বড়ই ভাবিত হইতেছেন এখনই যাইতে ইচ্ছা করি"।

পশুপতি। "আচ্ছা তবে আজ এস বাবা, এখানে কত দিন থাকা হইবে" ?

সুশীল। "তাহার ঠিক নাই, যদি এখানে থাকা হয় তবে এক সপ্তাহ মধ্যে বাড়ী গিযা বাবাকে সমস্ত বলিয়া আসিব"। এই বলিয়া বৃদ্ধকে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ আনন্দে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "এখানে যত দিন থাকিবে একবার একবার এস বাপু, আমার অমৃত শীঘ্রই আসিবে"।

সুশীল। "আজ্ঞা আসিব অমৃত বাবুর সহিত সাক্ষাতের আমার বিশেষ আবশ্যকতা আছে, তবে আজ আসি"।

সুশীলকুমার একবার মোহিনীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন। মোহিনী এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা হইয়া তাঁহাকে অতৃপ্ত নয়নে দেখিতেছেন। যেমন সুশীল-

কুমার তাঁহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন অমনি তাঁহার লজ্জা-মাখা সুধাংশু-বদনখানি অবনত হইল। সুশীলকুমার হৃদয়খানি মোহিনীকে অর্পণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। মোহিনী তাঁহার প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিল। দেখিতে দেখিতে সুশীলকুমার তাঁহার দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া পড়িলেন। মোহিনী ক্ষুণ্ণ মনে তাঁহারই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে সে স্থান হইতে চলিয়া গেলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সুখ শয্যা।

চুণিলালের উচ্চ প্রাসাদের দ্বিতলস্থ একটী সজ্জীভূত প্রশস্ত কক্ষ মধ্যে বহুমূল্য কাষ্ঠের পালঙ্কোপরি দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যার উপর অতুল সৌন্দর্য্যময় সুকোমল শরীর ঢালিয়া একটী যুবতী নিদ্রা যাইতেছেন। মুক্ত বাতায়ন দিয়া নির্ম্মল চন্দ্রকিরণ আসিয়া যুবতীর সমুদয় শরীর আলিঙ্গন করিতেছে। যুবতীর সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণের সহিত চন্দ্রমার বিমল কিরণ মিশাইয়া যাইতেছে। উন্মুক্ত গবাক্ষ দিয়া মৃদু মৃদু দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হইয়া যুবতীর মুক্তকেশ

জাল এবং তাহার পরিহিত ঈষৎ-গোলাপি রঙ্গের স্নচিক্বণ শাড়ীখানি অল্প অল্প উড়িতেছে। যুবতীর স্নগোল মৃণাল-হস্তে সরু সরু দুগাছি স্নবর্ণময় বালা। কর্ণে দুইটী হীরা-মুক্তা-জড়িত কুণ্ডল। গলদেশে দুইনর একটা মুক্তাহার, চাঁদের ক্রোড়স্থিত উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় বোধ হইতেছে। যুবতীর লোহিত রংএর কোমল হস্তে একখানি পুস্তক, পার্শ্বে রৌপ্য-ময় তাম্বূলাধার তাহাতে কতকগুলি তাম্বূল। যুবতীর তৎকালীন অবস্থা দেখিলে মনে হয যুবতী পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িযাছেন। কক্ষটী অতি পরি-পাটী রূপে সজ্জিত। গৃহস্থিত প্রত্যেক দ্রব্য গৃহকর্ত্রীর স্নন্দর রুচির পরিচয় দিতেছে।

একটী যুবা ধীরে ধীরে সেই কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে নিদ্রিতা যুবতীর পার্শ্বে বসি-লেন। একখানি হস্ত আপন গণ্ডদেশে স্থাপন পূর্ব্বক অনিমেষ নয়নে যুবতীর রূপ রাশি অতৃপ্ত নয়নে দেখিতে লাগিলেন। প্রত্যেক অঙ্গ অত্যঙ্গ নিরী-ক্ষণের পর একবার গগনমধ্যস্থিত পূর্ণচন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। পুনর্ব্বার যুবতীর প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন। এ হাসির অর্থ "স্নধাময়ী! স্নধাংশুর সৌন্দর্য্য হইতে তোমার সৌন্দর্য্য অল্প কিসে"?

তৎপরে যুবতীর একখানি হস্ত আপন হস্তে লইয়া ধীরে ধীরে ডকিলেন, উষা! উষাবতী শশব্যস্তে শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। তৎপরে ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন কখন আসিয়াছ ?

হীরালাল। "প্রায আধ ঘণ্টা হইবে।"

উষা। "আমায় এতক্ষণ ডাক নাই কেন ?"

হীরালাল। "তোমার সুধামাখা রূপরাশি দেখিযা অতুল আনন্দ লাভ করিতেছিলাম"। উষা হাস্য কবিয়া কহিলেন "এই চার বৎসরের দেখাতেও দেখা শেষ হয় নাই" ?

হীরালাল। "দেখায় কি তৃপ্তি হয় ? তবে আমি চলিয়া গেলে অনিমিষ নয়নে চাহিয়া থাক কেন" ?

উষা। "রমণীর নযনানন্দ আর কি আছে" ?

হীরালাল। "পুরুষের নয়নানন্দ আর কি আছে"?

উষা। "যাক্ ভাই আর সে কথা তুলিব না অনেক সময় যাইবে। তুমি বল সমাজে আজ কি বিষয়ে বক্তৃতা শুনিয়া আসিলে" ?

হীরালাল। বক্তৃতার বিষয় "সত্যের জয়," বক্তৃতাটি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল"।

উষা। বক্তৃতাব বিষযত পূর্ব্বেই শুনিযাছি, বিস্তৃত কবিযা বল।

হীবালাল। “এই ব্রাহ্মধর্ম্মই সত্যের অবতার, সমুদয় অসত্য বিনাশ করিয়া সত্য সংস্থাপিত করিতেই ব্রাহ্মধর্ম্মের অভ্যুত্থান”।

উষা। “ভাল করিয়া বুঝাইয়া বল”।

হীরালাল। “লোকের জ্ঞাতসারে-অজ্ঞাতসারে, আশ্চর্য্য রূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম জয় লাভ করিতেছে। দেখিতে দেখিতে বেগশালী স্রোতের ন্যায় ইহা সমুদয় সভ্য জগতে ছড়াইয়া পড়িতেছে, কাহার সাধ্য ইহার প্রতিকূলতা জন্মায়” ?

উষা। “কেন এই যে স্থানে স্থানে কত প্রতিকূল সভা হইতেছে, ইহার বিরুদ্ধে কত বক্তৃতা হইতেছে, ইহাতে কি ইহার প্রতিবন্ধক হইবে না” ?

হীরালাল। বৃথা আশা, সত্যের প্রতিবন্ধক কবিবে মানুষের সাধ্য কি ? তবে লোকবিশেষেব সমাজবিশেষের অনিষ্ট হইতে পারে, ধর্ম্মের কি হইবে ? ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যের আধার, সমুদায় সত্য লইয়াই ইহার আবির্ভাব। এই যে ঊনবিংশ শতাব্দির সভ্য সমাজের শিক্ষিত লোক ইহারা কাহার জোরে এখনও টিকে আছে ? ব্রাহ্মসমাজে যোগদিক আর নাই দিক, ব্রাহ্মদের সপক্ষে থাকুক আর বিপক্ষেই থাকুক ভগবান স্বয়ং ইহার দাতা হইয়া প্রাণে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মের অক্ষয় বীজ নিহিত করিয়া দিতে-

ছেন, এক দিন নিশ্চয়ই ইহা সুফল প্রদান করিয়া পতিত দেশ, পতিত মানুষ, পতিত সমাজ উদ্ধার করিবেই করিবে। হরিসভাই বল, কৃষ্ণসভাই বল ভাবিয়া দেখিলে সকলের উদ্দেশ্যই সত্য সনাতন ধর্ম্ম প্রচার করা"।

উষা। "কেন ইহারা ত পৌত্তলিকতা দৃঢ কবিবার জন্যই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছে"।

হীরালাল। যে রূপেই হউক যথার্থ ধর্ম্মপিপাসু হইয়া ধর্ম্মচর্চ্চা করিলেই ভগবান তাহার ফল প্রদান করেন। এক দিন সে অবশ্যই প্রকৃত সত্য ধর্ম্ম যাহা তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইবে। ব্রাহ্মধর্ম্ম সীমাবদ্ধ ধর্ম্ম নহে, খেতের চাষা, কোণের বৌ, স্কুলের ছেলে, টোলের পণ্ডিত, শিক্ষিত শিক্ষক প্রভৃতি সকলেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রতিপালন করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যাহা সত্য তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম, ইহা পূর্ব্বে ছিল এখন নাই এরূপ নহে সত্য পূর্ব্বেও ছিল এখনও আছে। আবার চিবকাল নিত্য নূতন আকারে সাধু হৃদয়ে সমুদিত হইবে। দয়াময় শ্রীহরি অতি সুসময়ে ব্রাহ্মধর্ম্ম এই পতিত দেশে প্রদান করিযাছেন। এই সময় যদি ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব না হইত ত দেশের কি ভয়ানক দুরবস্থাই হইত, নাস্তিকতার কি ভয়ানক প্রাধান্যই হইত, মনে হইলে হৃৎকম্প হয। ব্রাহ্মধর্ম্মে

কোন মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব নাই ভগবান স্বয়ংই ইহার প্রদাতা”।

উষা। “আচ্ছা তবে ব্রাহ্ম সমাজের বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে না কেন”?

হীরালাল। “তার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ দেখা যায ব্রাহ্ম সমাজ পৃথিবীতে যত প্রকার অসত্য দুর্নীতি প্রভৃতি আছে তৎসমুদায় বিনাশ করনাশযে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, আর কোন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা এইরূপ করেন নাই। তার পব দেখা যায় ইহা খাঁটি সোণা ইহাতে রসান নাই। প্রভুব উদ্দেশ্য ঠিক রাখিয়া সংসার ধর্ম্ম এক করিয়া জীবাত্মা পরমাত্মায় যোগই ইহার প্রধান লক্ষ্য। ইহাঁরা অবনত মস্তকে সমুদায জগতের নিকট সত্য গ্রহণ করেন, শিক্ষা লাভ কবেন এবং চিরকাল করিবেন কিন্তু কোন মধ্যস্থ কিম্বা গুরুবিশেষ গ্রাহ্য করেন না। ইহাঁদের গুরু স্বয়ং পতিতপাবন ভগবান। এই ধর্ম্মে বাহ্যিক কোন আড়ম্বব গ্রাহ্য নহে। ইহার গতি অতি সূক্ষ্ম। অন্য অন্য ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেবা কতকগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরের সহিত এক বিষয লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। ধর্ম্মের সহিত, নীতির সহিত, ধর্ম্মের সঙ্গে সমাজেব সঙ্গে ইহাদের বিশেষ সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। এই রূপে জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্মযোগ একত্রে কেহই সাধন

করিতে বলেন নাই”। তার পর আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রতিবন্ধক আছে যথা উপযুক্ত প্রচারকের অভাব ইত্যাদি”।

উষা। “আচ্ছা ইহারই মধ্যে ইহাদের এত মত-ভেদ দেখা যায় কেন”?

হীরালাল। “যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই স্বাধীনতা, যেখানে স্বাধীনতা সেইখানেই মতভেদ। এই পবিত্র ভারতের ন্যায় কোন স্থানেই ধর্ম্মের এত চর্চ্চা হয় নাই। কোন স্থানেই এত ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক জন্মান নাই। কোন স্থানেই ধর্ম্মের এত বিভিন্ন মত দেখা যায় না। ব্রাহ্ম ধর্ম্মের মূল স্থান প্রত্যেক মনুষ্যেরই ঠিক আছে। আর লোক-বিশেষের মত লইয়াই বা আমাদের আবশ্যক কি? ধর্ম্ম আমাদের হৃদয়ে, দয়া-ময়ের কৃপায় প্রাণপণে তাহা প্রতিপালন করিতে পারিলেই আমরা কৃতার্থ হইব”।

উষা। কালে সমুদয় সাধকেরাই ত দেখা যায় জাতিভেদ, কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা পরিহার পূর্ব্বক এক পরব্রহ্মের পূজাতেই নিযুক্ত হন, তবে ব্রাহ্ম হই-বার আবশ্যক কি”?

হীরালাল। হাঁ এখন অনেকেই ঐ কথা বলেন বটে যে জড়পূজা করিতে করিতে শেষে যথার্থ ঈশ্বর জ্ঞান লাভ হইবে। কিন্তু ঈশ্বরজ্ঞান তাহাদের

পূর্ব্বেই হইয়াছে নতুবা জড়পূজার জ্ঞান আসিল কোথা হইতে”? “পৃথিবীতে পরমহংস কত জন হইযাছিলেন? কত জন আছেন? পরমহংস না হইলে ত আর প্রকৃত ঈশ্বরপূজা করিতে পারিবে না? তাহা অতি অল্পলোকের ভাগ্যেই ঘটিয়াছে”।

উষা। “তবে ব্রাহ্মরাই কি প্রকৃত রূপে ঈশ্বর-তত্ত্ব বুঝিয়াছেন” ?

হীরালাল। “সাধ্য কি? অনন্ত অগম্য প্রভুকে কার সাধ্য ধারণা করিতে পারে” ?

উষা। তবে পৌত্তলিকের সঙ্গে বিশেষ রহিল কি” ?

হীরালাল। “প্রকৃত মাকে মা বলা। মনে কর মায়ের শক্তি বুদ্ধি জ্ঞান প্রভৃতি আমি ক্ষুদ্র শিশু কিছুই বুঝি না তাই বলিয়া কি আমি যাহাকে বুঝি এমন একটা শক্তিহীনাকে মা বলিযা ডাকিব? ঐ শক্তিহীনাকে মা বলিযা ডাকিতে ডাকিতে ববং আমি দিন দিন প্রকৃত মা হইতে দূরে গিয়া পড়িব। অভ্যাস-দোষে কখন প্রকৃত মাকে মা বলিতে সক্ষম হইব না। দিন দিন ঐ জ্ঞানহীনা মার স্বভাবানুযাযী সন্তান হইয়া যাইব। এই জন্যই জগতের হিতাকাঙ্ক্ষী ব্রাহ্ম মহো-দযেরা পৌত্তলিকতা বিনাশ করিযা প্রকৃত মাকে মা বলিয়া ডাকাইবার জন্যই বদ্ধপরিকর হইযাছেন”।

তৎপরে উষাবতী গদগদ কণ্ঠে কহিলেন "প্রভু পরমেশ্বর ধন্য যে তোমা হেন পতিরত্ন দিয়া আমায় পরম সুখে রাখিযাছেন। আমিও ধন্য কারণ আমা হেন ক্ষুদ্র রমণী হইযা তোমার ন্যায় দেবচরিত্র স্বামী পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আমার ন্যায় ভাগ্যবতী কয় জন?" বলিতে বলিতে উষার গণ্ড বহিয়া দুই ফোঁটা আনন্দাশ্রু গড়াইয়া পড়িল। উষা হীরালালের পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে দিলেন।

হীরালাল। গদগদ কণ্ঠে কহিলেন "ধন্য কৃপাময় ঈশ্বর যে তোমা হেন অশেষ গুণবতী পত্নী দিয়া আমায় কৃতার্থ করিয়াছেন। আমিও ধন্য কারণ তোমা হেন প্রকৃত ধর্ম্মপত্নী লাভ করিয়াছি। পৃথিবীতে আমার ন্যায় সৌভাগ্যবান কয়জন। আমার ন্যায় সৌভাগ্য কয়জনের যে যথার্থ সহধর্ম্মিণী পায়"?

উষা। "আমি ক্ষুদ্র অধম আমি কি বুঝি? তোমার ধর্ম্মেই আমি ধার্ম্মিকা, তুমি আমার শিক্ষা গুরু। কত অভাগিনী আছে যাহারা এই মুক্তিপ্রদ ধর্ম্মের নামও শুনে নাই। স্বার্থপর পুরুষেরা তাহাদিগকে বিনাশের কার্য্য, দাসীর কার্য্য ভিন্ন আর কিছু মাত্র প্রয়োজনে আনে না। কয়জন পতি তোমার ন্যায় আপন পত্নীকে ধর্ম্মপত্নী রূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন"?

হীরালাল। "তুমিও আমার শিক্ষা গুরু। আহা! সেই দিন গরিব ভিখারীদের ছেলেগুলিকে যখন তুমি নিজের হাতে পরিষ্কার করিয়া স্নান করাইয়া নূতন ধুতিগুলি পরাইয়া নিজের হাতে পরিবেশন পূর্ব্বক নানাবিধ সুখাদ্য মায়ের মত খাওয়াইতেছিলে তখন আমি স্বর্গের ছবি দেখিয়াছিলাম। যেখানে রোগী, যেখানে শোকী, যেখানে দুঃখী সেই খানেই আমার ঊষা; যেখানে জ্ঞান, যেখানে ভক্তি, যেখানে প্রেম, যেখানে বুদ্ধি সেইখানেই আমার ঊষা। প্রিয়তমে! তোমার মত ভার্য্যা কার আছে? আবার যখন সে দিন তুমি প্রতিবাসিনী রমণীদিগকে মহাভারত হইতে গীতা পড়িয়া শুনাইতেছিলে ও ব্যাখ্যা করিতেছিলে সেই দিন তোমার শিষ্য হইতে আমার অভিলাষ হইতেছিল। আবার বাবা যখন গদগদ হইয়া সকলের নিকট তোমার সুখ্যাতি করেন, তখন আমি আনন্দে এত অধীর হইযা পড়ি পাছে কোন রূপ আনন্দের চিহ্ন প্রকাশ হইযা পড়ে সেই ভয়ে সে স্থান হইতে দ্রুত প্রস্থান করি"।

ঊষা স্বামীর মুখে সুখ্যাতি শুনিয়া মনে মনে প্রভু পরমেশ্বরকে বার বার ধন্যবাদ দিলেন। তার পর কহিলেন "আমি অতি ক্ষুদ্র আমা হইতে কত মহৎ আছেন। রাত্রি অনেক হইয়াছে তোমার অসুখ

করিবে এখন নিদ্রা যাও।" তৎপরে উভয়ে সুখশয্যায় শয়ন করিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পিত্রালয়ে গমন।

দুর্দ্দান্ত কাল! তোমার অসাধ্য কি আছে? তোমার প্রচণ্ড আক্রমণ হইতে কাহারও নিস্তার নাই। আজ যিনি সুসজ্জিত রম্য অট্টালিকায় বাস করেন, শত শত মনুষ্য যাহার পদসেবা করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তিই হয় তো তোমার ভয়ানক আক্রমণে একজন সামান্য দীন মাত্র। আজ যে স্থান যে নগর অগণ্য হর্ম্মমালায় বিভূষিত দেখা যাইতেছে, বহুলোকের বসতিতে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়া লোকলোচন পরিতৃপ্ত করিতেছে কখন না কখন তোমার স্পর্শে তাহা ঘোর অরণ্য রূপে পরিণত হইবে। আবার অরণ্যও কালে ভীষণ সাগর রূপে পরিণত হইয়া অগাধ জলরাশিতে পরিপূর্ণ হইবে। তুমি কখন কাহাকেও একভাবে দেখিতে পার না, কাহারও চির সুখ অথবা চির দুঃখ তোমার সহ্য হয় না। জানি না তোমার প্রেরয়িতা প্রভু কি উদ্দেশ্য

সাধনের জন্য অনবরত এই পৃথিবীতে তোমায় বিঘূর্ণিত করিতেছেন। তাবৎ বস্তু প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে।

অদ্য স্নেহলতার খুল্লতাত স্নেহকে ও তাঁহার মাতাকে লইতে আসিয়াছেন। স্নেহের পিতা যদুনাথ সাংঘাতিক পীড়িত। শ্যামা এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলভাবে অবিরত অশ্রু বর্ষণ করিতেছেন। স্নেহও মাতার সঙ্গে সঙ্গে কাঁদিতেছেন। সকলই ঘোর বিষাদে মগ্ন, কাহারও মুখে কথা নাই।

কতক্ষণ পরে শ্যামা তাঁহার ভ্রাতার নিকট গিয়া সরোদনে সবিশেষ বলিয়া স্বামীগৃহে যাইবার জন্য প্রস্তাব করিলেন।

চুনিলাল প্রথমে সমুদয় শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন। পরক্ষণেই তাঁহার অন্য ভাবের উদয় হইল। তিনি কহিলেন "শ্যামা! আমার বোধ হয় ইহার কোন গূঢ় কারণ আছে, কখনই যদুনাথের কোন পীড়া হয় নাই। আমার বোধ হয় তোমাদের লইয়া যাইবার তাঁহার কোন বিশেষ মতলব আছে"।

শ্যামা। "সে কি দাদা! এ কি কখনও হইতে পারে? আমার সঙ্গে তিনি মতলব করিবেন? তাঁহার আর কোন্ মতলব, নিশ্চয় তিনি পীড়িত হইয়াছেন। তুমি অদ্যই আমার যাইবার নৌকাদি সব ঠিক

করিয়া দাও। কল্য প্রাতঃকালেই আমি রওয়ানা হইব”।

চুনিলাল। “শ্যামা। বুঝিয়া কাজ করিও ; যাইও না, আমার কোন মতেই ভাল বোধ হইতেছে না”।

শ্যামা। “না দাদা, আমার মন বড়ই অস্থির হইয়াছে, আমি যাইব বাধা দিও না”।

চুনিলাল। “তোমাকে আমি আর কিছু বলিব না, তোমার যাহা ইচ্ছা কর কিন্তু স্নেহকে লইয়া যাইতে পাইবে না”।

শ্যামা। “সে কি দাদা, তাও কি কখন হয়? স্নেহ তাঁহার একমাত্র সন্তান। স্নেহকে তিনি প্রাণাপেক্ষা স্নেহ করেন। স্নেহকে দেখিবার জন্যই তিনি বিশেষ উৎসুক হইয়াছেন”।

চুনিলাল। মস্তক দুলাইয়া বলিলেন “তা তুমি স্নেহকে কখনই লইয়া যাইতে পারিবে না। স্নেহকে লইয়া যাইবার যে বিশেষ আবশ্যক তা আমি বেশ জানি”।

শ্যামা ব্যাকুল ভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন “আমাদের যাইবার সব ঠিক করিয়া দাও দাদা, তোমার পায়পড়ি আর বাধা দিও না”।

চুনিলাল স্নেহের ভগিনীর চক্ষে অবিরল জলধারা

প্রবাহিত দেখিয়া সকলই ভুলিয়া গেলেন। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন যে তাঁহার অনুমান মিথ্যাও হইতে পারে। যদি সত্যই যদুনাথ পীড়িত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহাদিগকে না পাঠাইলে চিরদিন শ্যামার মনে ও স্নেহের মনে অপরিসীম একটা দুঃখ থাকিয়া যাইবে। এই সমুদায় চিন্তা করিয়া অগত্যা স্বীকৃত হইলেন। এবং একজন কর্ম্মচারীকে ডাকিয়া নৌকাদি সমুদয় প্রস্তুত করিতে হুকুম দিলেন।

শ্যামা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া সে স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। সে রজনীতে যে যার কার্য্য সমাপন করিয়া স্বীয় স্বীয় কক্ষে শয়ন করিলেন। শ্যামা স্বীয় কক্ষে শয্যার উপরি শয়ন করিলেন। শয়ন করিলেন মাত্র আজ আর তাঁহার নিদ্রা নাই। নিদ্রার পরিবর্ত্তে স্বামীর নানা রূপ অমঙ্গল চিন্তা আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিল। তাঁহার নয়ন হইতে অবিরল জলধারা প্রবাহিত হইয়া উপাধান সিক্ত করিতে লাগিল। আহা! তাঁহার সরল হৃদয়ে স্বামীর কত প্রকার অমঙ্গল কল্পনারই উদয় হইতে লাগিল। জলস্রোতের ন্যায় কত অমূলক চিন্তা অবিশ্রান্ত তাঁহার হৃদয়ে আসিয়া তাঁহাকে ব্যাকুল করিতে লাগিল। স্বামী যাইবার সময় যে সকল বাদানুবাদ করিয়াছেন তৎসমুদায়ই তাহার নিজের অপরাধ বলিয়া মনে মনে

কতই অনুতপ্ত হইতে লাগিলেন এবং সেই স্বকৃত অপরাধের ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য ব্যাকুল হইতে লাগিলেন। স্বামী যাইবার সময় যে বলিয়া গিয়াছিলেন "জন্মের মত চলিলাম" শ্যামার মনে ঘন ঘন তাহাই উদয় হইয়া তাঁহাকে অধীর করিয়া তুলিল। শ্যামা প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কখন স্বামীর বিরুদ্ধে কোন কার্য্য করিবেন না। আহা! তাঁহার পবিত্র সরল হৃদয় প্রতি মুহূর্ত্তে স্বামীর অমঙ্গল চিন্তায় অধীর হইতে লাগিল। বিপদহারী ভগবানের নিকট স্বামীর মঙ্গলার্থে কতই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। এইরূপ দুর্ব্বিষহ চিন্তায় এক, দুই, তিন করিয়া কক্ষস্থ ঘটিকায় চারিটা বাজিয়া গেল। শ্যামা বাতায়ন পার্শ্বে আসিয়া উপবেশন পূর্ব্বক সূর্য্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বাকাশে সুখতারা দেখা দিল। প্রতিবেশিনী দুই একটী বৃদ্ধা স্বীয় বৌ ঝিদের ডাকিয়া প্রাতে কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া পাড়ার অন্যান্য সঙ্গিনীদের ডাকিয়া গঙ্গাস্নানে চলিয়া গেলেন। ক্রমে পূর্ব্ব গগন পরিস্কার হইল। সুস্নিগ্ধ প্রাতঃ সমীরণ প্রবাহিত হইতে লাগিল। সূর্য্য যেন শ্যামার স্তবে তুষ্ট হইয়া সহাস্য বদনে ক্রমে ক্রমে পূর্ব্বাকাশে প্রকাশ হইল, তাহা দেখিয়া বিহঙ্গকুল মঙ্গলসূচক সঙ্গীতধ্বনি করিতে করিতে চতুর্দ্দিকে

আনন্দ প্রচার করিতে ধাবমান হইল। সেই বিহঙ্গ-কণ্ঠ-নিঃসৃত মধুরধ্বনি শুনিতে শুনিতে ঈশ্বরের পবিত্র নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক গৃহের তাবৎলোক শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন।

শ্যামা প্রাতঃক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া আবশ্যক দ্রব্যাদি মাঝিদের দিতে লাগিলেন। সমুদয় দ্রব্যাদি বোটে উঠান হইল। তাঁহারা কথঞ্চিতরূপে স্নান আহার করিয়া সকলের নিকট বিদায় লইতে লাগিলেন। স্নেহ বিষাদিত হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে প্রিয় সহচরী উষাবতীর নিকট বিদায় লইতে গেলেন, গিয়া কি দেখিলেন? দেখিলেন উষা পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন পূর্ব্বক উপাধানে মুখ রাখিয়া অবিরল অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। স্নেহ ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক উষার পার্শ্বে বসিয়া ডাকিলেন বৌঠাকুরুণ! উষা সত্বর গাত্রোত্থান করিয়া স্নেহের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। স্নেহ উষার অকৃত্রিম ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া ও তাঁহার বিচ্ছেদ ভাবিয়া একেবারে অস্থির হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ উভয়ে নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিলেন, কাহারও বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। উষা স্নেহের অধীরতা দেখিয়া ক্রন্দন সম্বরণ পূর্ব্বক সস্নেহে স্নেহের অশ্রু মুছাইতে মুছাইতে কহিলেন "অসুখ করিবে আর কেঁদ না দিদি।"

স্নেহ। "আমি কাঁদিবার জন্যই হইয়াছি চির দিন কাঁদিব"।

উষা। "ও কি কথা, অমন কথা কি মুখে আনিতে আছে"?

স্নেহ মনের আবেগে বলিলেন "বৌঠাক্‌রুণ! অমৃত বাবুকে কহিও"।

উষা। "কি বলিব বলনা আমার কাছে আবার লজ্জা"।

স্নেহ। "না কিছু না"।

উষা। "বটে আমার কাছে বলিবে না? আচ্ছা অমৃত বাবু আসিলে বলিব স্নেহ তোমার জন্য কোনে খুঁজতে গিযাছে"।

স্নেহের মুখে আজ আর হাসি আসিল না। তিনি ধীরে কহিলেন "সে ভার তোমার উপর দিয়া গেলাম"।

উষা। "আচ্ছা সে ভার আর তোমায় দিতে হইবে না আমি তাহা পূর্ব্বেই ঠিক করিয়া রাখিয়াছি, এখন বল কি বলিতেছিলে"?

স্নেহ। "বলিও জন্মের মত ভুলিতে। আহা! তাঁহার শান্তিময় হৃদয়ে আমি কত অশান্তিই দিয়াছি"। বলিতে বলিতে স্নেহের কণ্ঠ অবরোধ হইয়া. আসিল, আর বলিতে পারিলেন না।

উষাবতী সস্নেহে স্নেহের স্নেহমাখা বদনখানি

মুছাইতে মুছাইতে কহিলেন "ছি ভাই স্নেহ! তুমি ও সব কি বলিতেছ? অমন কথা মুখে আনিও না"।

স্নেহ। বৌঠাক্‌রুণ। আর কিছুর বাসনা নাই কিন্তু জানিনা কেন দেখিবার ইচ্ছাটা কোন মতেই যাইতেছে না। আর একটীবার দেখিতে বড় ইচ্ছা রহিল"।

উষা। "ছিঃ ভাই এক মাসের জন্য যাইতেছ এত অধীর হইতেছ কেন?"

স্নেহ। "কি জানি, তোমরা বলিতেছ এক মাসের জন্য আমার মনে হইতেছে আমার সুখের দিন অন্ত হইল। এখন অবশিষ্ট জীবনের জন্য দুঃখময় সাগরে ঝাঁপ দিতে যাইতেছি। জানি না কি হইবে ঈশ্বরের যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক"।

তাঁহাদের এই প্রকার কথা বার্ত্তা হইতেছে এমন সময় শ্যামা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া কহিলেন "মা স্নেহ! এখন তবে এস। বৌমা! এখন আমরা বোট ছাড়িব সাবধান হইয়া থাকিও মা। তোমায় আর বেশি কি বলিব মা! দাদার কোন বিষয় কষ্ট যেন না হয়। বৌঠাকুরাণীর শরীর অসুস্থ তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিও"।

উষা সাশ্রুলোচনে শ্যামার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। তৎপরে স্নেহের হস্ত ধরিয়া কহিলেন "সর্ব্বদা

চিঠি লিখো।” স্নেহ কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না। মাতার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন। শ্যামা একে একে সকলের নিকট বিদায় হইয়া বোটে উঠিলেন। মাঝিরা বোট খুলিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই অদৃশ্য হইল।

নবম পরিচ্ছেদ।

নূতন দেশ।

ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিনের পর বোট আসিয়া পদ্মার বিশাল বক্ষে পড়িল। শরৎকাল চঞ্চলা পদ্মা এখন স্থির জলরাশিতে পূর্ণ, চতুর্দ্দিক ধুমাকার দৃষ্ট হইতেছে। মৎস্য কচ্ছপ আদি জলচর জন্তু সকল উল্লাসে নদীর সুনির্ম্মল জলে ক্রীড়া করিয়া বেড়াইতেছে। শ্যামল পত্রাচ্ছাদিত তরুকুল সুগন্ধী কুসুমে সজ্জিত হইয়া পার্শ্বস্থ বনভূমি সুসৌরভে পূর্ণ করিতেছে। বৃক্ষের উচ্চশাখায় উপবেশন করিয়া দিগ্‌দিগন্ত স্বর-লহরীতে ভাষাইয়া বিহঙ্গমগণ অপূর্ব্ব গানে মগ্ন রহিয়াছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাখীগুলি লতাগুল্মের কোমল পত্রাবরণে লুকাইয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছে। তরুতল সকল বালুকাময় পরিষ্কার ও

পরিচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে লতাগুল্মের কুঞ্জবন। সমুদায় বনভূমি পবিত্রতা ও শান্তির আবাসস্থান বলিয়া বোধ হইতেছে।

প্রকৃতির এই মনোহর শোভা দেখিতে দেখিতে সপ্তম দিবসে বোট বিক্রমপুর ঘাটে পৌঁছিল! নদীর নিকটেই যদু বাবুর বাড়ী। তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা পাইয়া দুইটী প্রাচীনা আসিয়া শ্যামা এবং স্নেহকে বোট হইতে তুলিয়া লইয়া গেল। শ্যামা বাড়ীর নিকট যাইয়া সহসা চমকিয়া উঠিলেন, কারণ দেখিলেন যদুনাথ দিব্য সুস্থ শরীরে বাহিরের দরজায় দাঁড়াইয়া হুক্কা হস্তে তামাকু টানিতেছেন ও মৃদু মৃদু হাসিতেছেন। তাঁহার শরীরে পীড়ার চিহ্নমাত্র নাই। স্নেহ যদুনাথকে প্রণাম করিয়া প্রাচীনাদ্বয়ের সঙ্গে শ্যামার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের আগমনবার্ত্তা পাইয়া বাড়ীর ও পাড়ার সমুদায় স্ত্রীলোকেরা ব্যস্তসমস্ত হইয়া দেখিতে আসিল, এবং দিগন্ত কাঁপাইয়া হুলুধ্বনি দিতে আরম্ভ করিল। সেই আকাশব্যাপী হুলুধ্বনি শুনিয়া এবং প্রায় সকল বালিকা, যুবতী ও প্রৌঢার নাসিকাতে এক একটী আলম্বিত ঘণ্টার ন্যায় স্বর্ণময় নোলক দোদুল্যমান দেখিয়া স্নেহের সেই বিষাদমাখা শুষ্ক ওষ্ঠে হাস্য দেখা দিল। শ্যামা কখনও স্বামীগৃহে আসেন নাই, তাঁহার

পক্ষে সমুদায়ই নূতন কিন্তু তাঁহার মন এই সমুদায়ের কিছুই লক্ষ্য করিতেছিল না, তিনি যদুনাথকে তদবস্থায় দেখিয়া অবধি অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছিলেন। চুনীলাল তাঁহাকে যে সন্দেহের কথা বলিয়াছিলেন তাহা বার বার তাঁহার স্মরণ হওয়ায় আরও অধিকতর ভীত হইতে লাগিলেন। একটী প্রৌঢ়া শ্যামার হস্ত ধরিয়া একটী গৃহমধ্যে লইয়া নানা রূপ কুশলাদি জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন। পরিচয়ে জানা গেল ইনি শ্যামার দেবরপত্নী। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া সকলেই দুই চারিটী আলাপ করিয়া প্রস্থান করিল। প্রস্থান সময়ে অনেক প্রতিবেসিনী শ্যামার হস্তাধিক অবগুণ্ঠন না দেওয়ার বিষয় ও নির্লজ্জার ন্যায় আলাপাদি করার বিষয়, এবং স্নেহের অলৌকিক রূপের বিষয় আন্দোলন করিতে লাগিলেন।

স্নেহ এতক্ষণ দাঁড়াইয়া এই সমুদায় ব্যাপার দেখিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার নাম ধরিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল। স্নেহ পরিচিত স্বর শুনিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন একটী যুবা দাঁড়াইয়া হাসিতেছেন; যুবার হাস্যের সহিত স্নেহও ঈষৎ হাসিলেন। এই যুবা স্নেহের খুল্লতাতপুত্র নিরূপম। ইনি মধ্যে মধ্যে স্নেহের মাতুলালয় যাইয়া থাকেন। ছেলেটির বয়স একুশ বাইশ বৎসর

হইবে। দেখিতে শুনিতে লেখা পড়ায় একরূপ মন্দ নয়।

স্নেহ উঠিয়া নিরূপমের সহিত আর একটী গৃহে গেলেন। সেই ঘরটি নিরূপমের। ঘরখানি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, দুই একখানি পরিষ্কার 'পরিষ্কার দ্রব্যে' সাজান। নিরূপম স্নেহকে আপন শয্যাপার্শ্বে বসাইয়া কহিলেন, "স্নেহ! তোর এখানে একটুও ভাল লাগছে না, না? গিরির সঙ্গে আলাপ করিলে অনেকটা ভাল বোধ করিবে। ঘরে আর কেহ নাই এই সময় তাহাকে আনিয়া তোর সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেই"। এই বলিয়া দ্রুতপদে সেই স্থান হইতে চলিয়া গেলেন। গিরি নিরূপমের স্ত্রী।

স্নেহ অবসর পাইয়া অবস্থা সকল ভাবিতেছেন এমন সময় নিরূপম গিরিবালাকে সঙ্গে করিয়া উপস্থিত হইলেন। গিরি অর্দ্ধ ঘোমটা দিয়া আসিয়াছিলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া ঘোমটা সরাইয়া দিলেন। স্নেহ দেখিলেন দিব্য চাঁদের মত মুখখানি। চক্ষু দুইটি বড় বড়, ভ্রু দুটি টানা, কপালখানি মাজা তাহাতে কোঁকড়া কোঁকড়া কাল চুলগুলি পড়িয়াছে, রং বেশ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। পাতলা পাতলা রাঙ্গা টুক টুকে ঠোঁট দুখানি টিপে টিপে মৃদু মধুর হাসিতেছে, গড়নখানি পাতলা ও আকৃতি ছোট।

বয়স চতুর্দ্দশের অধিক বোধ হয় না। স্নেহ একটু হাসিয়া গিরির একখানি হাত ধরিয়া আপনার পাশে বসাইয়া কহিলেন "বেশ সুন্দরী বৌ ;—নিরু দাদা তবে আমাদের কাছে মিথ্যা বড়াই কর নাই।"

নিরূপম। "হুঁ মিথ্যা বড়াই,আমার আর একটী বিদ্যাধরীকে দেখিলে তুমি মূর্চ্ছা যাইবে।"

স্নেহ। "সে কি নিরুদা আবার একটী বিয়ে করেছ নাকি ?"

নিরু। "তা না হইলে কি কুলীনের মর্য্যাদা থাকে ? বাবা ও জ্যেঠা মহাশয় বলিয়াছেন আর দুইটি করিতেই হইবে নতুবা তাঁহাদের মেয়ের বিয়ে হইবে না।"

স্নেহ। "না নিরুদা আর বিয়ে করিও না, দেখ দেখি কেমন লক্ষ্মীর মত বৌটি।"

নিরূপম স্নেহের ভাব দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, "না, দিদি আবার ? বাবার ও জ্যেঠা মহাশয়ের নিতান্ত অনুরোধে এই বিয়েটা করিয়াছি। কিন্তু তাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন আর আমায় এ বিষয় অনুরোধ করিবেন না।"

তাঁহাদের এই প্রকার নানা রূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় এক জন বৃদ্ধা আসিয়া স্নেহকে আহারের জন্য ডাকিল। স্নেহ গিরিবালার হস্ত

ধরিয়া আহারের স্থানে লইয়া গেলেন। আহারাদি শেষ হইলে সকলে শয়ন করিলেন।

শ্যামা শয়নগৃহে গিয়া দেখিলেন যদু বাবু খাটে বসিয়া তামাকু টানিতেছেন। শ্যামা গৃহে প্রবেশ করিবা মাত্র সহাস্য বদনে শ্যামার হস্ত ধরিয়া বসাইযা কহিলেন, "শ্যামা আজ আমি সুস্থ হইলাম, আমার পীড়া আরোগ্য হইল।" শ্যামা বুঝিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ কবিলেন, কিছুই উত্তর করিলেন না।

যদুনাথ পুনরায় কহিলেন "কেমন শ্যামা তোমাদের এখানে আনিয়া ভাল করি নাই ?"

শ্যামা এবার বিষাদপূর্ণ স্বরে কহিলেন "কেন আর জ্বালাও।"

যদু। "ছিঃ শ্যামা বিরক্ত হও কেন ? মঙ্গল কাজে কি বিরক্ত হইতে আছে ? আমি স্নেহের জন্য আমা অপেক্ষা উচ্চ কুল মান সম্পন্ন সুপাত্র স্থির করিযাছি, কল্যই পুরোহিত ডাকিযা বিবাহের দিন স্থির করিব।"

শ্যামার মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, তিনি আকুলভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন "তোমার কাছে কি অপরাধ করিয়াছি যে তুমি আমার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ ? তোমার পায় ধরিযা মিনতি করি আমার একমাত্র স্নেহের

ধর্ম, স্নেহের পুত্তলী স্নেহকে চির দুঃখময় সমুদ্রে নিক্ষেপ করিও না।”

যদু। “তুমি ইহাতে দুঃখ জ্ঞান করিতে পার কিন্তু আমি ইহাতে পরম সুখ অনুভব করি।”

শ্যামা। “এই জন্য এত ছল না করিয়া আনিয়াছ। আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। দাদা তুমি দেবতা তোমার অনুমান মিথ্যা হইবার নয়। আহা! তুমি আমায় আসিতে কতই বারণ করিযাছিলে, হায়! আমি তখন কেন তোমার কথা শুনিলাম না?”

যদু। “আর কেন বিরক্ত কর?”

আজ শ্যামা ফাঁদে পড়িয়াছে। শ্যামা পুনর্ব্বার কাতর স্বরে কহিলেন“তোমার পায়ে পড়ি, এই ভয়ানক সংকল্প পরিত্যাগ কর, কেন চির অশান্তি ডাকিয়া আন? কেন শত্রুর ন্যায আমার সর্ব্বনাশ কর? আহা স্নেহ যে আমার বড় পিতৃবৎসলা, তার কি পরিণামে এই পুরস্কার?”

যদু। “বিরক্ত করিও না ঘুমাইতে দাও।”

শ্যামা অগত্যা শয্যার একপার্শ্বে বসিয়া নীরবে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। যত প্রকার ভাবনা আসিয়া তাঁহার হৃদয়ে প্রবাহিত হইতে লাগিল। ভাবনারও বিরাম নাই, অশ্রুরও বিরাম নাই।

দশম পরিচ্ছেদ।

বিন্দা পিসি।

বিক্রমপুরস্থ রূপ্‌সা নামক গ্রামে যদুনাথের বাড়ী। সেই গ্রামে বিন্দা পিসি বলিয়া এক কুলীন কন্যা বাস করেন। তিনি জ্ঞাতিসম্পর্কে যদুনাথের পিসি হন। অনেকেরই প্রায় জ্ঞাতিসম্পর্কে পিসি হওয়ায় গ্রামস্থ প্রায় সকলেই তাঁহাকে বিন্দা পিসি বলিয়া ডাকিত। বিন্দা পিসির বযস প্রায় ষাইট বৎসর। এই বৎসর দুই হইল কোন এক নব্বই বৎসরের বৃদ্ধের গলে বরমাল্য প্রদান করিযা অনূঢ়া নাম ঘুচাইয়াছেন। বৃদ্ধ বিবাহেব দিন দশ পরেই বিন্দা দেবীকে বিধবা করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। বিন্দা দেবী এখন বিধবা। বিন্দা দেবী কুলের গৌরবে সদাই স্ফীত। বিন্দা পিসি এক অতি গুরুতর কাজে সদাই ব্যস্ত। গ্রামেব সমুদয় বার্ত্তা বাড়ী বাড়ী বহন করিযা থাকেন। বোধ হয শ্যামার আগমনবার্ত্তা পাইয়া আজ যদুনাথেব বাড়ী আগমন করিযাছেন। বেলা চাব টার সময বিন্দা পিসি যদু বাবুর বাড়ী উপস্থিত হইলেন। ঘরের বৌ ঝি সকলেই আপন আপন হাতেব কাজ ফেলিয়া বিন্দা দেবীকে অভ্যর্থনা-

সহকারে বসাইয়া চারিদিক ঘেরিয়া বসিলেন, যেন অমাবশ্যার রজনীকে নক্ষত্র ঘেরিল। কেহ কহিল "বিন্দা দিদি আমাদের একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন।" একজন কহিল "বিন্দা পিসি এক মাস পরে আসিয়াছেন।" কেহ বলিলেন "পথ ভুলে এসেছেন বুঝি।" বিন্দা দেবী বলিলেন "হাঁ তাই ত এখনকার মেয়ে তোরা তোদের কথায় কে পারে? বাবা, আমরাও এককালে যুবতী ছিলাম, কৈ তোদের মত তো এক দিনও ছিলাম না। হরধন মুখর্য্যার তের বছরের মেয়ে কি কাণ্ডই কোরেছে।" তার এই বার্ত্তার সূত্রপাত দেখিয়া সকলেই কহিয়া উঠিলেন "কি করেছে বিন্দা পিসি?" বিন্দা পিসি হাত নাড়িয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিল "বরকে ভালবাসাইতে যাইয়া ঔষধ খাওয়াইয়া পাগল করিয়াছে।" বিন্দা পিসির এই কথা শুনিয়া সকলেই আহা! আহা! করিয়া উঠিল। কেহ কহিল "ছুঁড়ি আপনার সর্ব্বনাশ আপনি করিল।" কেহ বলিল "আহা! এই অল্প বয়স," কেহ বলিল "তার স্বভাবের দোষ আছে।" কেহ বলিল "আহা! অমন কথা বলিও না, মাতঙ্গির স্বভাব বড় ভাল"। কেহ বলিল মাতঙ্গির স্বামীর বিয়ে কযটা? "বিয়ে আর বেশি কি এই বাইশ তেইশ বৎসর বয়স মাত্র ছয়টা বিয়ে বৈত নয়"? একটী যুবতী হাসিয়া কহিল বাইশ তেইশ বৎসর

বয়সে ছয়টা বিয়ে বুঝি বড় কম হইল। বিন্দা পিসি মুখভঙ্গী করিয়া কহিল "তোরা কলিকালের মেয়ে তোরা সব একলা ভোগ করিতে চাস্। কুলীনের ঘরে জন্মেছিস অত সুখের আশা কেন? বাইশ বছরে ছয়টা বিয়ে বেশি হইল? আমার কর্ত্তা নব্বই বৎসর বয়সে একশর বেশি বিয়ে করিয়াছিলেন। কুলীনের শিরোমণি অমন কুল কি আর আছে?" বিন্দা দেবীর চক্ষে জল আসিল। বিন্দা পিসির ভাব দেখিয়া কোন কোন যুবতী তাঁহার অসাক্ষাতে মুখ লুকাইয়া হাসিতে লাগিল। বিন্দা পিসি চোক মুছিয়া পুনর্ব্বার কহিল, "বাবা, এখনকার মেয়েদের পায় নমস্কার। সে দিন অমনি রাম গাঙ্গুলির মেয়েটা স্বামীকে ভালবাসাইতে গিয়া এমনই ঔষধ খাওইয়াছিল যে ছোঁড়ারে মেরে ফেল্লে। আহা! ছোঁড়ার বয়সই বা কত বছর চল্লিসের বেশি হইবে না। সর্ব্বনাশীও তেমনি লজ্জায় ও ঘৃণায় গলায় দড়ি দিয়া মরেছে। কেবল বাইশটা অভাগিনীকে বিধবা করিয়া গিযাছে। আরে মোল তোদেব ভালবাসিযাই বা কি করিবে? তাদের কি চাল চুলা আছে, যে তোদের নিয়া যাইবে; না টাকা কড়ি আছে, সোণা দানা দিবে? তবে ভালবাসিলেও যা না ভালবাসিলেও তা। বাবা, কি কলিকালই হইয়াছে মাসে দশটা

ভ্রূণ হত্যা হইতেছে, বছর চব্বিশটা বেরিয়ে যাই-তেছে। হতভাগিনীদের মরণ নাই? আর মরেই বা কি করিবে? যমের নরকেও আর স্থান কুলায় না।” তার পর একটী প্রৌঢ়া কহিয়া উঠিল “বিন্দা দিদি! তোমা-দের বল্লালসেন'ত নরকের রাজা হইয়া বসিয়াছেন। নরকের সমুদায় বিষয়ের সমুদায় স্থানের অধিকারী তিনি। তাঁর কাছে আমরা সকলে মিলে স্থানের জন্য দরখাস্ত করিলে হয় না?” তৎপরে আর একটি যুবতী বলিয়া উঠিল “ঠিক বলিয়াছ দিদি, সেই একশ হইতে এক মাসের এইরূপ বারটি এক রাত্রে যে বিয়ে করি-য়াছিল তাকে দিয়াই এই দরখাস্তটা করান যাউক।” পরে এক বাক্যে সকলেই বল্লালসেনের গোষ্ঠী গোত্র ধরিয়া অজস্র গালি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। একটা ঝি গালে হাত দিয়া এই সমুদায় অপূর্ব্ব কথা শুনিতে ছিল। সকলকে এই রূপ গালী দিতে দেখিয়া গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল এবং তার গালাগালির সিন্দুক খুলিল। আর হাত মুখ নাড়িয়া কহিল “তার সর্ব্বনাশ হউক সে শীঘ্র যমের বাড়ী যাউক ইত্যাদি।” সকলে তার এই রূপ ভাব দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। বিন্দা দেবীর আর সহ্য হইল না। তিনি মুখ বিকৃত করিয়া কহিয়া উঠিলেন “আ মর মাগি, তুইও আবার ব্রাহ্মণকে গালি দিস, মহাব্যাধি হইবে, খসে গলে

মরিবি। বল্লালসেন যমের পুরাণ হইয়া গিয়াছেন। তোরে যম ডাকিয়াছেন নরকে দিবে বলিয়া"।

ঝি সরোষে কহিল "আছ আছ তুমি বামনী, তুমি অমন মরার গাল দিবার কে"? সকলে দেখিল গতিক ভাল নয়, ঝিকে বলিল যা, যা, সন্ধ্যা হইয়াছে কাজে যা। ঝি কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল "কেন গা ও বামনী আমায় মরণের গাল দিবে? ওর কি আমি খাই, না পরি?" এই বলিতে বলিতে চলিয়া গেল।

শ্যামা ও স্নেহ এতক্ষণ চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় বসিয়া এই সব ব্যাপার দেখিতেছিলেন ও শুনিতেছিলেন; গতিক মন্দ দেখিয়া সে ঘর হইতে অন্য ঘরে চলিয়া গেলেন। সন্ধ্যা অতীত হইতে দেখিয়া বিন্দা দেবী গমনকালে দুই একটী সম্ভাষণ করিয়া গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল। যে যার কার্য্যে চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

বিবাহ প্রস্তাব।

মৃজাপুর—একটি পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র কুটীরের একটি ক্ষুদ্র কক্ষে একটি বালিকা রাঙ্গা রাঙ্গা পদদ্বয় জড়াইয়া আপন মনে সুখের স্বপ্নে বিভোর হইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে, মৃদু মৃদু গাইতেছে। বালিকার সম্মুখে একখানি ডালায় কতকগুলি সুগন্ধি পুষ্প রহিয়াছে। সুন্দর অঙ্গুলি দ্বারা বালিকা একটি একটি পুষ্প বাছিয়া বাছিয়া মালা গাঁথিতেছে। বালিকার করপদ্মে পুষ্প-গুলি হীনপ্রভ বোধ হইতেছে।

এমন সময় দুইটি যুবা সেই কক্ষে প্রবেশ করি-লেন। একটি যুবা সস্নেহে ডাকিলেন মোহিনী! মোহিনী চাহিয়া দেখিলেন সম্মুখে অমৃতলাল ও সুশীল-কুমার দাঁড়াইয়া। মোহিনী পদদ্বয় সঙ্কোচ করিয়া মৃদু হাস্যের সহিত সলজ্জভাবে চারু বদনখানি অবনত করিলেন। অমৃতলাল কহিলেন এত সুন্দর করিয়া কাহার জন্য মালা গাঁথিতেছ? "তুমি যে মালা ভাল-বাস, অনেক দিন তোমায় মালা গাঁথিয়া দেই নাই। কলিকাতায় তোমায় কেউ মালা গাঁথিয়া দেয় না দাদা"? বালিকা এই কথাগুলি যখন বলিতেছিল

তখন সুশীলকুমার মোহিত হইতেছিলেন। তিনি এমন সরলতাময় মধুর কথা কখনও শোনেন নাই। বালিকার নীলোৎপল বড় বড় চক্ষু দুইটীর কোণে লজ্জা ও আনন্দমাখা হাসি ভাসিতেছিল। অমৃতলাল হাসিতে হাসিতে কহিলেন "সেখানে কি তোর মত আমায় কেউ ভালবাসে যে আমায় মালা গাঁথিয়া দিবে? সকলকে যদি মালা গাঁথিয়া দিতে হয় তবে তুই সুশীলকুমারের জন্য গাঁথিয়াছিস্ কই? তারে একছড়া দিবিনি?" বালিকা লজ্জায় আর মস্তক উন্নত করিতে পারিল না। অমৃতলাল পুনরায় কহিলেন "বল তাঁকে একছড়া দিবি কি না?" মোহিনী সম্মতিসূচক মাথা নাড়িল। অমৃতলাল সস্নেহে মোহিনীর পৃষ্ঠে চাপড়াইয়া কহিলেন "আচ্ছা, খুব লক্ষ্মী মেয়ে, তার জন্য খুব সুন্দর করিয়া একছড়া গাঁথিস"। তৎপরে সুশীলকুমারের একখানি হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "চল ভাই মোহিনী তোমার প্রতি সদয় হইয়াছে," এই বলিয়া অন্য আর এক কক্ষে প্রস্থান করিলেন। সুশীলকুমার অগত্যা অনিচ্ছায় বাঞ্ছিত স্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমৃতলালের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া গেলেন। অমৃতলাল, যে কক্ষে তার পিতা বসিয়াছিলেন সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

পশুপতি মহাশয় সুশীলকুমারকে দেখিয়া আনন্দ-

সহকারে আপন পার্শ্বে বসাইয়া নানা কুশল বিষয়ের জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। সুশীলকুমার অবনত মুখে প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ বহুবিধ কথাবার্ত্তার পর পশুপতি মহাশয় সুশীলকুমা-রের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "বাবা সুশীল! আমার স্নেহের ধন মমতাময়ী মোহিনী তোমার দ্বারাই অসীম বিপদ হইতে রক্ষা পাইযাছে, তোমার সেই অসীম সাধুতার পুরস্কার স্বরূপ সেই অমূল্য ধন মোহিনীকে তোমার পবিত্র হস্তে সম্প্রদান করিতে মনস্থ করি-য়াছি, গ্রহণ করিযা বৃদ্ধের সহস্র সহস্র আশীর্ব্বাদ লও এই আমার প্রাণের ইচ্ছা।" সুশীলকুমারের বোধ হইল তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন। আকাশের চাঁদ যদি সহসা কেহ তাঁহাকে আনিয়া দিতে পারিত তাহা হইলেও ইহা অপেক্ষা তিনি আশ্চর্য্য হইতেন না। মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রকাণ্ড পৃথিবী তাঁহার মস্তকোপরি একবার ঘুরিয়া গেল, শিরায় শিরায় রক্ত সকল প্রবাহিত হইতে লাগিল। কি উত্তব দিবেন স্থির করিতে পারিলেন না, পাছে মনোভাব প্রকাশ হইয়া পড়ে এই ভয়ে জড়সড় হইলেন।

অমৃতলাল তাঁহাব তৎকালীন ভাব দেখিয়া ও মনোভাব বুঝিয়া হাস্য করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "মৌনং সম্মতিলক্ষণং"।

সুশীলকুমার নতশিরে জড়িত স্বরে কহিলেন "পিতার ইচ্ছা পূর্ব্বে জানা কর্ত্তব্য।"

পশুপতি। "অবশ্য তাঁহাকে এ বিষয় কল্যই আমি পত্রে লিখিব"।

সুশীল। "বাবার আজ কালের মধ্যেই এখানে আসিবার কথা আছে"।

পশুপতি। "তুমি কি এইখানেই কাজ আরম্ভ করিবে?"

সুশীল। "বাবা আসিলে ঠিক করিব।"

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে অমৃতলালের জননী আসিয়া আহার করিবার জন্য ডাকিলেন। বৃদ্ধ সুশীলকুমারের হস্ত ধরিয়া আহারের স্থানে লইয়া গেলেন। নানা প্রকার কথাবার্ত্তায় আহার সমাপ্ত হইল অমৃতলাল সুশীলকুমারের হস্ত ধরিয়া ছাদের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। অমৃতলাল মোহিনী সংক্রান্ত নানা রূপ কথা পাড়িয়া বুঝিলেন সুশীলকুমার মোহিনীর নিকট হৃদয় হারাইয়াছেন। সুশীলকুমার ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, "কি সুন্দর জ্যোৎস্না!" এমন সময় মোহিনী কুঞ্চিত কেশরাশি দোলাইতে দোলাইতে গজেন্দ্রগমনে আসিয়া অমৃতলালকে মধুর স্বরে কহিল "এই মালা আনিয়াছি আজ তত ভাল হয় নাই।"

"আজ বুঝি তোর মন কাহাকেও ভাবিতেছিল"। এই বলিয়া অমৃতলাল হাস্য করিয়া মালা গ্রহণ করিলেন। মোহিনী লজ্জায় জড়সড় হইয়া ভাবিল "বা! দাদা তো বেশ মন বুঝিতে পারেন"। অমৃতলাল মালা দেখিয়া বলিলেন "তুই ছড়াই যে আমাকে দিলি? সুশীলকে দিলি না"? মোহিনী ধীরে ধীরে ক্ষুদ্র বদনখানি উত্তোলন করিয়া সুশীলকুমারের প্রতি চাহিলেন। দেখিলেন সুশীলকুমার তাঁহারি প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিয়াছেন। চারি চক্ষের শুভ মিলন হইল। লজ্জায় মোহিনীর মৃগনয়ন নত হইল। ধীরে ধীরে হেলিতে দুলিতে সুশীলকুমারকে মোহিত করিয়া মোহিনী প্রস্থান করিল। সুশীলকুমারের বোধ হইল বিজলী খেলিতে খেলিতে সহসা অদৃশ্য হইল। অমৃতলাল দেখিলেন সুশীলকুমার মোহিনীর গমনপথে এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছেন। অমৃতলাল সুশীলকুমারের প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাসিলেন। হাসির ভাব দেখিয়া সুশীলকুমার লজ্জিত হইলেন। অমৃতলাল হাসিয়া সুশীলকুমারকে মালা পরাইয়া কহিলেন, "এ মালা এখন তোমাকেই শোভা পাইবে তুমিই পর।"

"তুমিই যে মালা বদল করিলে" বলিয়া সুশীলকুমার ঈষৎ হাসিলেন।

একজন ভৃত্য আসিয়া সুশীলকুমারকে কহিল আপনার বাড়ী হইতে আপনার পিতা আসিয়াছেন। সুশীলকুমার গাত্রোত্থান করিয়া কহিল "তবে আজ যাই। তুমি কি তবে কল্যই কলিকাতায় যাইবে"?

অমৃত। "কল্যই যাইব, আবার তোমার মালা-বদল দেখিতে বৈশাখ মাসে আসিব তুমি মধ্যে মধ্যে এখানে আসিও"। সুশীলকুমার হাস্য করিয়া কহিলেন "তবে এখন আসি, চিঠিপত্র লিখিতে ভুলিও না"।

সুশীলকুমার প্রস্থান করিলে অমৃতলাল স্বীয় অদৃষ্ট ভাবিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে শয়নাগারে গিয়া শয্যায় শয়ন করিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

রোগ শয্যা।

সুশীলকুমার একটি দ্বিতল অট্টালিকায় একটি সুপরিষ্কৃত কক্ষে পালঙ্কোপরি শয়ন করিয়া একখানি পুস্তক পাঠ করিতেছেন। একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল আপনার জন্য একজন সন্যাসী নীচে অপেক্ষা করিতেছেন। তিনি বলিলেন "শীঘ্র আপনাকে প্রয়ো-

জন"। সুশীল কুমার সত্বর নীচে আসিয়া দেখিলেন পূর্ব্বপরিচিত সেই যোগীবর তার অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। সুশীল কুমার সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিলেন। সন্ন্যাসী কহিল "শীঘ্র আমার সঙ্গে আইস বিশেষ প্রয়োজন আছে"। সুশীল কুমার দ্বিরুক্তি না করিয়া যোগীবরের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহারা ক্রমান্বয়ে সেই পূর্ব্বপরিচিত পর্ব্বতপথ দিয়া যোগীবরের সেই কুটীরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সুশীল কুমার যোগীর আজ্ঞায় কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সেই স্নেহের প্রতিমা যোগিনী একখানি তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার বদন মণ্ডলের সেই অমানুষিক জ্যোতিরাশি হীনপ্রভ বোধ হইতেছে। তাঁহার সেই চারুদেহলতা তৃণশয্যায় মিসিয়া যাইতেছে। তিনি সাংঘাতিক পীড়িতা। নিকটে সেই পূর্ব্ব পরিচিত বালক গিরি সজল নয়নে যোগিনীর মুখের দিক তাকাইযা রহিয়াছে। যোগীবর নিকটে গিয়া ডাকিলেন "মা সরোজ"। যোগিনী নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন সুশীলকুমার ম্লান বদনে দাঁড়াইয়া। যোগিনীর সেই শুষ্ক ম্লান বদনে ঈষৎ প্রফুল্লতা ভাসিল। যোগিনী সুশীলকুমারকে বসিতে সঙ্কেত করিলেন। সুশীলকুমার বিমর্ষচিত্তে যোগিনীর পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। যোগীবর সে

স্থান হইতে কার্য্যান্তরে প্রস্থান করিলেন। যোগিনী ক্ষীণস্বরে কহিলেন "বৎস সুশীল! আজ আমার শেষ দিন। আমার শেষ আশীর্ব্বাদ তোমায় দিবার জন্য এতকষ্ট দিয়া তোমায় আনিয়াছি।" সুশীল কুমার বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে স্তম্ভিত হইয়া যোগিনীর মমতা-মাখা-পবিত্র মুখের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। যোগিনী ক্ষীণ স্বরে বলিতে আরম্ভ করিলেন। "বৎস সুশীল! তুমি বোধ হয় জান তুমি যখন দুই বৎসরের তখন তোমার পুণ্যবতী জননী ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে তোমার পিতা এই অভাগিনীকে বিবাহ করেন। বৎস! বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে যেন কেহ কখন মুগ্ধ না হয়। পতঙ্গ যেমন দীপশিখার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া আপন জীবন সেই অনলকুণ্ডে অর্পণ করে, আমিও তেমনি তোমার পিতার অত্যাশ্চর্য্য সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, হৃদয় অর্পণ করিলাম। পিতা আমার দূরদর্শী বিজ্ঞ, পিতার আমি বই জগতে দ্বিতীয় কেহ ছিল না। আমিও এ জগতে পিতা বই কাহাকেও জানিতাম না। জ্ঞান হওয়া অবধি পিতাই পিতৃমাতৃস্থানীয় হইয়া অপার স্নেহে আমায় পালন করিতেন। আহা! পিতার আমি অধম সন্তান, জন্মিয়া অবধিই পিতাকে অশেষ ক্লেশ দিয়াছি। তোমাদের এক গ্রামে আমা-

দের বাড়ী ছিল। তোমার পিতা প্রায়ই আমাদের বাড়ী আসিতেন। তৎপরে পিতাকে বিবাহের অভিপ্রায় জানাইলেন। পিতা প্রথমে অস্বীকার হইলেন, পরে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া আমায় ডাকিয়া কহিলেন "মা সরোজ! অক্ষয়কুমারের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইও না, তাহার স্বভাব সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলে"। আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম লজ্জা ত্যাগ করিয়া কহিলাম, সে সমুদয় মিথ্যা। তখন আমার বয়স চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিক হইবে না। বালিকাস্বভাব জানিতাম না যে মনোহর কুসুমেও কীট থাকে। পিতা আমার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়া বিবাহ দিয়া নিশ্চিন্ত মনে যাহা কিছু ছিল বিবাহে যৌতুক দিয়া ধর্ম্মার্জ্জন মানসে কাশীধামে প্রস্থান করিলেন। আমি কিয়ৎ দিবস স্বামী সোহাগে, মনের সুখে স্বামীগৃহে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলাম! কিন্তু অভাগিনী বিমাতা! কে কবে সুখী হইয়াছে? প্রাণপন করেও বা কে কবে যশো লাভ করিয়াছে? আমার অদৃষ্টে অনেক দিন আর স্বামীসোহাগ সহিল না। প্রাণের সহিত তোমায় লালন পালন করিতে লাগিলাম, তাহাতেও নানা জন নানা কথা কহিত ও নানা প্রকার বিদ্রূপ করিত। মন খুলিয়া একটু আদর করিলে লোকে হাসিয়া নানারূপ কুৎসা করিত।

আবার তোমার কোন দোষ হেতু একটু শাসন করিলে বলিত "আহা সোনার চাদ ছেলেকে রাক্ষসী করে মারিয়া ফেলিবে। সাপিনীকে গৃহে আনিয়া অবধি বাছার সমুদয় সুখ ফুরাইয়াছে। আহা! ওর মা থাকিলে কি আজ ওর অমন দশা হইত, বাছার কত আদর হইত"। আবার তুমি বালস্বভাব হেতু কাহারও কোন অনিষ্ট করিলে, আমায় গালি দিয়া কহিত বিমাতা মন্দ হইলে তার আর কি ভালাই হয়? তাই শাসন না কবিয়া ছেলেটার সর্ব্বনাশ করিয়াছে"। অভাগিনী বিমাতা হইয়া সহ্য করিতেই জন্মিয়াছিলাম, নীরবে সকলি সহ্য করিতাম। ক্রমে ক্রমে তুমি নয় দশ বৎসরের হইলে লোকে তোমার পবিত্র সরল মনে নানা প্রকার কূট শিক্ষা দিতে লাগিল। শেষে তুমিও তাহাদের পরামর্শে বালকস্বভাব প্রযুক্ত অভাগিনীর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিতে লাগিলে। অবশেষে স্বামীও বিষ-নয়নে দেখিতে লাগিলেন। হায়! দুঃখিনীর জগতে আর কেহই নাই। শিশুকালে অজ্ঞানাবস্থায় মাতার মৃত্যু হয়, মাতার স্নেহ কিরূপ জানি না। যে দেবস্বরূপ পিতার স্নেহে বর্দ্ধিতা হইয়াছিলাম সেই পিতা স্বামীর গৃহে রাখিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিরুদ্দেশ হইলেন। হতভাগিনীর মুখের প্রতি একবার করুণ দৃষ্টি করে এ জগতে এমন আর কেহই

নাই। সমুদয় জগত দুঃখিনীর প্রতি বিমুখ হইল। ক্রমে স্বামীর এত অপ্রিয হইলাম যে দেখা হইলেই বিনা কারণেও দশবার তিরস্কার করিতেন। স্বামী দেবতা, আমার অদৃষ্টদোষেই সমুদয় ঘটিযাছিল। তাঁর কথা আর কত বলিব। পিতার নিকট যে সকল দোষের কথা শুনিয়াছিলাম তৎসমুদাযই সত্য বলিয়া ক্রমে জানিতে পারিলাম। অভাগিনীর কেহ নাই, কার কাছে কাঁদিব? অন্তর্যামী ভগবানের কাছে কাঁদিয়া কথঞ্চিত শান্ত হইতাম। বাবা সুশীল! তোমার বোধ হয় মনে পড়ে, তোমায় আমি বিরলে পাইলেই নানা প্রকারে বুঝাইতাম। তুমিও সকলের কুমন্ত্রণা ভুলিয়া সদয় হইতে; কিন্তু আমার সহিত কথা কহিয়াছ শুনিযা তোমায় আরও অধিক কুমন্ত্রণা দিত। অবশেষে এমন ভযানক যন্ত্রণাদায়ক কুৎসা আরম্ভ করিল ও নানা প্রবার যন্ত্রণা দিতে লাগিল যে আমার বাড়ীতে অবস্থান করা একেবারেই অসাধ্য হইযা উঠিল। স্বামীব তিরস্কার এত অসহনীয় হইল যে আত্মহত্যা যে মহা পাপ তাহাও সময়ে সমযে স্মরণ থাকিত না। এইরূপে সাত আট বৎসর কাটিয়া গেল। অকস্মাৎ তোমার সাংঘাতিক পীড়া হইল। প্রাণপণে ব্যাকুল হইয়া তোমার শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। তোমার পীড়া হইল তাও যেন আমার

অপরাধ। আমায় সকলেই নানা রূপ কুবাক্যে তিরস্কার করিত। একদিন তোমার পিসিমা মুখ আরক্তিম করিয়া আমায় অকারণ কহিতে লাগিলেন, "রাক্ষসী, তুই আসিয়া অবধি বাছার এক দিনও রোগ ছাড়ান নাই, নিশ্চয়ই তুই বাছাকে কি খাওয়াইয়াছিস্? আমি ত শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। কাঁদিতে কাঁদিতে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। ঈশ্বরের নিকট তোমার আরোগ্যের জন্য কতই প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলাম তুমি আরোগ্য হইলেই পিতার উদ্দেশে প্রস্থান করিব। দয়াময় ঈশ্বরের প্রসাদে শীঘ্রই তুমি আরোগ্য লাভ করিলে। তোমাকে সুস্থ দেখিয়া করুণাময় ঈশ্বরকে প্রাণ খুলিয়া ধন্যবাদ দিলাম।

তোমাদের বাড়ী হইতে হাবড়া ষ্টেসন অতি নিকট। আমি অনাথিনী, বাইশ বৎসর বয়সের সময় বিশ্বপিতা অনাথনাথ ঈশ্বরে আত্ম সমর্পণ করিয়া এক দিন গোপনে পিতার উদ্দেশে বারাণসী প্রস্থান করিলাম। অঙ্গে যে সামান্য দুই একখানি অলঙ্কার ছিল তাহা খুলিয়া বাক্সে রাখিলাম। সামান্য একখানি মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া পিতার প্রদত্ত টাকা হইতে সামান্য কিছু লইয়া অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে করিতে রেল গাড়ীযোগে প্রস্থান করিলাম। আমার প্রস্থানের

কথা বোধ হয় তোমার কিছু কিছু স্মরণ থাকিতে পারে। তখন তুমি একাদশ বর্ষের বালক”। যোগিনীর শীর্ণ কলেবর কাঁপিতে লাগিল। যোগিনী আর কথা কহিতে পারিলেন না। সুশীলকুমার এতক্ষণ নিবিষ্টচিত্তে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে এই দুঃখময় কাহিনী শুনিতেছিলেন। তিনি আর শুনিতে পারিলেন না, ব্যাকুল হইয়া কাতরচিত্তে যোগিনীর পদদ্বয় ধারণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন “মাতঃ! আমি জঘন্য অধম, ক্ষমার অযোগ্য, তোমার চরণে কত অপরাধ করিয়াছি আমায় ক্ষমা কর”। যোগিনীর অসীম আনন্দরাশি ধারণ করিবার শক্তি হইল না। যোগিনী মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সুশীলকুমার ব্যস্ত হইয়া মূর্চ্ছা অপনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে যোগীবর কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া যোগিনীর অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া কাতর হৃদয়ে কহিলেন “মা সরোজ! ইহকালের জন্য কি ছাড়িয়া চলিলে? সুশীলকুমারের শুশ্রূষায় ও যোগীর গম্ভীর আহ্বানে যোগিনীর জ্ঞানসঞ্চার হইল। নেত্র উন্মীলন করিয়া কহিলেন “পিতঃ! শরীর অবসন্ন হইয়া আসিতেছে। বৎস সুশীল! স্বামী দেবতা, এই শেষ সময়ে একটিবার তাঁহার পদধূলি মস্তকে ধারণ করিতে পারিলাম না এই দুঃখ রহিল, নতুবা আর

কোন দুঃখ নাই। তুমি আমায় অন্তিম সময়ে বড় সুখী করিলে, আশীর্ব্বাদ করি সাধু ও সুখী হও”।

সুশীলকুমার কহিলেন “মাতঃ! পিতা এইখানেই আছেন, অনুমতি হইলে এখনই যাইয়া আনিতে পারি”। যোগিনী যোগীবরের প্রতি করুণ ভাবে দৃষ্টি-পাত করিলেন। যোগীবর তাঁহার ভাব বুঝিযা সুশীল-কুমারকে অনুমতি প্রদান করিলেন।

যোগিনী কহিলেন “বৎস! তোমার যাইবার প্রয়োজন নাই। পিতঃ! আমাদের গিরিকে প্রে-রণ করুন”। সুশীলকুমার কহিলেন “আমার নিকট লিখিবার উপকরণ আছে, আমি একটু লিখিয়া দেই”। সুশীলকুমার তাঁহার পিতাকে এই লোকসহিত অতি সত্বর আসিতে লিখিয়া দিলেন। যোগীবর গিরিকে অতি সত্বর প্রেরণ করিলেন। যোগিনী পুনর্ব্বার ব-লিতে লাগিলেন। “বৎস! আমি কাশীধামে আসিয়া পিতার অন্বেষণ করিতে লাগিলাম। পাছে কোন দুষ্ট লোকের মন্দ-চক্ষে পড়ি এই আশঙ্কায মস্তক-মুণ্ডন করিলাম এবং শরীবে ভস্ম মাখিয়া, পাগলিনীর ভাণ করিয়া, বহুতর কষ্টে এক সপ্তাহ দিন যামিনী পথে পথে রোদন করিয়া কাটাইলাম। এক দিন প্রাতঃকালে হতাশ অন্তরে বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে প্রবেশ করিতেছি, পথে পিতার সাক্ষাৎ পাইলাম। তৎপরে

পিতার চরণ ধারণ পূর্ব্বক কাঁদিতে লাগিলাম। পিতা আমায় চিনিতে পারিয়াও আমার দুঃখের বেশ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে আমি আমার দুঃখের কাহিনী সমুদয় নিবেদন কবিলাম। পিতা মধুর বচনে আমায় সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। আমি পিতার সান্ত্বনায় আনন্দিত হইযা সমুদয় দুঃখ দূর করিলাম। সেই অবধি পিতার সমীপে পবিত্র নিষ্কাম যোগীধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া পরমানন্দে ঈশ্বরারাধনায় রত হইয়া কৃতার্থ হইয়াছি। তাই তোমায় আশীর্ব্বাদ কবি বাবা! সকল দুঃখ নাশের ঔষধ, সকল সুখের আকর ধর্ম্মধন অর্জ্জন করিয়া অনন্ত কালের জন্য সুখী হও"।

যোগিনী আর বলিতে পারিলেন না। বাক্যরোধ হইয়া আসিল। দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইযা পড়িলেন। সুশীলকুমার ব্যাকুল হৃদয়ে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দেহত্যাগ।

লিপি প্রাপ্তি মাত্র অক্ষয়কুমার সেই প্রেরিত বালকের সহিত চলিলেন। যাইতে যাইতে তাঁহার হৃদয়ে নানা বিষয়ের আন্দোলন হইতে লাগিল। এ ঋষিবালক কে? সুশীলকুমার ইহাদের আশ্রমে গিয়াছে? আমাকে যাইবার জন্যই বা এত বিশেষ করিয়া লিখিয়াছে কেন? বালকের নিকট দুই একটি প্রশ্ন করিতে লাগিলেন কিন্তু বালকের নিকট কোন প্রশ্নেরই উত্তর প্রাপ্ত হইলেন না। অক্ষয়কুমার নানা প্রকার চিন্তা করিতে করিতে সেই পূর্ব্ববর্ণিত পার্ব্বতপথ দিয়া যোগীর কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কুটীরদ্বারে বৃদ্ধ যোগীবরকে দেখিয়া অক্ষয়-কুমার সহসা গমনে নিবৃত্ত হইয়া চমকিয়া উঠিলেন। যোগীবর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "ভয় নাই কুটীরে প্রবেশ কর"। অক্ষয়কুমার কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া সভয়ে কুটীরে প্রবেশ করিয়া শয্যাগত যোগিনীকে দেখিবা মাত্র হতজ্ঞান হইলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল। সুশীলকুমার পিতার ভাব দেখিয়া তাঁহাকে বসিতে বলিলেন। তৎপরে যোগি-

মীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন যোগিনী মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। সুশীলকুমার ব্যস্ততা সহকারে যোগিনীর মূর্চ্ছাপনয়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অক্ষয়কুমার বিস্মিত চিত্তে কহিলেন, ব্যাপার কি? ইতিমধ্যে যোগিনীর জ্ঞান সঞ্চার হইল, যোগিনী ক্ষীণ স্বরে কহিলেন 'জল,' সুশীলকুমার সযত্নে জল প্রদান করিতে লাগিলেন। যোগিনী অক্ষয়কুমারের প্রতি ধীরে ধীরে কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন "স্বামিন্! আমায় কি চিনিতে পার নাই? আমি তোমারই চির দুঃখিনী সরোজ। অভাগিনীকে দেখিয়া কি আশ্চর্য্য হইয়াছ? হতভাগিনী মরে নাই, সরোজ তোমার অবিশ্বাসিনীও নয়"। যোগিনীর কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, আর বলিতে পারিলেন না। অক্ষয়কুমারের সর্ব্বশরীর হইতে অজস্র ধারে ঘর্ম্ম নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল—তিনি উন্মত্তের ন্যায় যোগিনীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন, "সরোজ! আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর। সাধ্বী আমায় ক্ষমা করিবে না"? যোগিনীর এত সুখ সহ্য হইল না, তাঁহার ভাগ্যে স্বামীর এই রূপ সম্বোধন ঘটে নাই। তাঁহার নিকট সমুদায় পৃথিবী ঘূর্ণায়মান বোধ হইতে লাগিল; দুর্ব্বল শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল। যোগিনী পুন-

রায় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। অক্ষয়কুমার অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে লাগিলেন। সুশীলকুমার কাতর প্রাণে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অনেক ক্ষণ পরে যোগিনীর জ্ঞান উদয় হইল। তিনি নেত্র উন্মীলন করিয়া কহিলেন 'জল।' সুশীল সযত্নে জল প্রদান করিলেন।

অক্ষয়কুমার অশ্রু মুছিয়া ব্যাকুল হৃদয়ে কহিলেন "সরোজ! এত দিন আমায় তোমার সংবাদ দেও নাই কেন? আমি তোমার কত অন্বেষণ করিয়াছিলাম। আমি জানিতাম তুমি পবিত্রা কখন তোমায়ে পাপস্পর্শ করিবে না"।

ইতিমধ্যে যোগীবর কুটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরীক্ষায় জানিলেন আর বেশি বিলম্ব নাই, যোগিনীর স্বর্গারোহণের সময় নিকট। যোগিনী যোগীবরকে ক্ষীণস্বরে কহিলেন "পিতঃ! আর যে দেখিতে পাইতেছি না, আমি চলিলাম পবিত্র পদধূলি আমায় প্রদান করুন"। যোগিনী হস্ত প্রসারণপূর্ব্বক যোগীবরের পদধূলি মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং পুনর্ব্বার অক্ষয়কুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, স্বামিন্! মনের সাধ মনেই রহিল, ইহজন্মে তোমার পদসেবা করিয়া কৃতার্থ হই নাই, আশা করি লোকান্তরে এই সাধ পূরিবে"।

তৎপরে ক্ষুদ্র হস্তখানি প্রসারণ করিলেন, নিকটেই অক্ষয়কুমার বসিয়াছিলেন, পদধূলি গ্রহণ পূর্ব্বক মস্তকে দিলেন। হায়! মস্তক হইতে আর সে মৃণাল-নিন্দিত হস্তখানি নামিল না, স্ফুরিত ওষ্ঠদ্বয় মুদ্রিত হইয়া আসিল, তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। চিরদিনের মত সেই সুধামাখা স্বর রুদ্ধ হইল, কোমল নেত্রদ্বয় ক্রমে নিমীলিত হইয়া আসিল। যোগিনীর পবিত্র প্রাণবিহঙ্গ নানা ক্লেশ উপভোগ করিয়া অক্ষয় শান্তিধামে চলিয়া গেল। যোগীবর গম্ভীর স্বরে কহিলেন, "যাও মা! জরা, মৃত্যু, শোক, দুঃখ রহিত অনন্ত সুখের আগারে অনন্ত শান্তিধামে যাও"। এই বলিয়া অক্ষয়কুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "যাও সাধ্বীর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পন্ন কর"। এই বলিয়া সত্বর সে স্থান হইতে অদৃশ্য হইলেন। অক্ষয়কুমার সরোদনে সুশীলকুমারকে কহিলেন "যাও বৎস! চিতা প্রস্তুত কর। ওঃ স্বপ্নের ন্যায় সকল ফুরাইয়া গেল"।

সুশীলকুমার ভাগীরথীতীরে চিতা সজ্জিত করিয়া আসিলেন। তৎপরে পিতা পুত্রে শব বহন পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট স্থানে লইয়া গেলেন। সুশীলকুমার অশ্রু মুছিয়া কহিলেন "বাবা! মৃত শরীরের এত জ্যোতি ত কখন দেখি নাই। মার সকলি অলৌকিক"।

অনন্তর চিতামধ্যে পবিত্র সৌন্দর্য্যময় দেহলতা অর্পিত হইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সোণার দেহ ভস্মসাত হইয়া গেল। রজনী প্রভাত হইল। চতুর্দ্দিকে লোককোলাহল শ্রুত হইতে লাগিল। পৃথিবী সুন্দরী অপূর্ব্ব নূতন শোভা ধারণ করিল। উভয়ে শোকসন্তপ্ত চিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

চিরদিনের জন্য পিতা পুত্রের হৃদয়ে সরোজের অন্তিম সময়ের পবিত্র বাক্যগুলি ও পবিত্র ভাব সমূহ স্মরণ রহিল।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

স্বপ্ন।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে। নিশানাথ স্বকীয় বিমল কিরণ বিতরণ পূর্ব্বক যাবতীয় তরুলতা অট্টালিকা ভূভাগ প্রভৃতিকে যেন শুক্লাম্বরে মণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, সেই সুন্দর শোভায় সমুদয় প্রকৃতি প্রশান্ত মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নয়নপথের এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। রাজপথে আর কোন প্রাণীর পদসঞ্চার শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। পশু, পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় জীব জন্তু নিঃস্তব্ধ হইয়া রহি-

য়াছে। কেবল মধ্যে মধ্যে এক এক বার মন্দ মন্দ সমীরণভরে তরু, লতা পল্লবাদি মর মর শব্দে পরিচালিত হইতেছে। যেমন দীপ শিখা দিবাকর-কিরণে মন্দপ্রভ হয় সেইরূপ খদ্যোতপুঞ্জ নিশাকরকিরণে হীনপ্রভ হইয়া শূন্যমার্গে ও বৃক্ষশাখায় বিহার করিয়া বেড়াইতেছে।

মৃজাপুরের একটি কক্ষমধ্যে একটি যুবা পদসঞ্চালন করিয়া বেড়াইতেছেন, যেন কোন মর্ম্মান্তিক যাতনা যুবার হৃদয়কে দগ্ধ করিতেছে। যুবা অনেক ক্ষণ পরে একটি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক একবার চতুর্দ্দিক অবলোকন করিলেন। তৎপরে কি মনে করিয়া ধীরে ধীরে পরিস্কৃত শয্যার উপর তাঁহার অতুল রূপরাশি ঢালিয়া শয়ন করিলেন। অনেক ক্ষণ পরে যুবার নিদ্রাকর্ষণ হইল। যুবা গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। অমৃতলাল নিদ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিলেন যেন তাঁহার স্নেহের পুত্তলী স্নেহলতা হিংস্রজন্তুপরিপূরিত ঘোব বিজন অরণ্যে বাস করিতেছেন। সেই ভয়ঙ্কর অরণ্য হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ব্যাকুল চিত্তে পথ অন্বেষণ করিতেছেন, কিন্তু কোথায়ও পথ না পাইয়া অতি কষ্টে সেই লোহিত বর্ণ কোমল ক্ষুদ্র হস্ত দিয়া কণ্টকলতা ছিন্ন করিতে চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় একটা দুর্দ্দান্ত কালসর্প

তাঁহাকে দংশনাশায় ফণা তুলিল। তিনি ব্যাধতাড়িত হরিণীর ন্যায় কাতর চিত্তে সভয়ে দৌড়িতে লাগিলেন। হায়! সেই ভয়ানক সর্প তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল সে কিছুতেই সঙ্গ ছাড়িল না। বালিকা ক্লান্ত হইয়া ভয়বিহ্বল চিত্তে "উদ্ধারের জন্য" চিৎকার করিতে লাগিলেন, কিন্তু হায়! সে যে অরণ্যে রোদন! কেহই তাঁহাকে সেই ভীষণ সর্পের হস্ত হইতে রক্ষা করিল না, কেহই তাঁহাকে অভয় দান করিল না। তখন বালিকা মনে করিল, আমার ত কেহই নাই, তবে আর কাহার জন্য এত ক্লেশে জীবন রাখিব? হঠাৎ বালিকার স্মরণ হইল তাঁহার অতি সুহৃদ এমন একজন আছেন যাঁহাকে তিনি অসীম ক্ষমতাবান মনে করেন। বালিকা তখন কাতর চিত্তে তাঁহাকে ডাকিতে লাগিলেন। অবশেষে সেই ননীর পুতলি, "অমৃতলাল! তুমিও অভাগিনীকে ভুলিয়া গিয়াছ? উত্তর দিলে না? রক্ষা করিলে না"? এই বলিয়া ভূতলে ঢলিয়া পড়িলেন। অমনি সেই দুর্দ্দান্ত কালসর্প তাঁহার কোমল অঙ্গে আঘাত করিল। আহা! দেখিতে দেখিতে সেই সোণার অঙ্গ কালিমাকৃতি ধারণ করিল। অমৃতলাল যেমন "ভয় নাই," "ভয় নাই," বলিয়া ধাবমান হইলেন অমনি তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হইল। নিদ্রা ভঙ্গে তাঁহার সমস্ত শরীর

অবসন্ন প্রায় হইতে লাগিল, হৃদ্‌পিণ্ড ভয়ানক রূপে স্পন্দিত হইতে লাগিল। কণ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়া ঘন ঘন নিশ্বাস বহিতে লাগিল। স্বপ্নবৃত্তান্ত মুহুর্মুহু স্মরণ হওয়ায় তিনি নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। এমন কি সেই শিক্ষিত বীর অবশেষে বালকের ন্যায় রোদন করিয়া ফেলিলেন। যাতনা অসহ্য বোধ হইল। তিনি অস্থির ভাবে শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বাতায়ন সন্নিধানে গিয়া দেখিলেন রজনী প্রভাত হইয়াছে। পূর্ব্বাকাশের আলোক ধীরে ধীরে সমুদয় আকাশ ছাইয়া ফেলিতেছে। মলিন গগনে এখনও দুই একটি তারা উঁকি মারিতেছে। মৃদু প্রাতঃ সমীরণ প্রবাহিত হইয়া সমুদয় প্রাণীকে স্নিগ্ধ করিতেছে। দুই একটি বিহঙ্গ স্বীয় কুলায় ত্যাগ করিয়া আনন্দে প্রভাত ঘোষণা করিতে করিতে দিগদগান্তরে ধাবমান হইতেছে।

অমৃতলাল দেখিলেন সমুদয় প্রকৃতি পূর্ব্ববৎ শোভাসম্পন্ন রহিয়াছে. কিন্তু তিনি আর সে রূপ নাই। তিনি আজ প্রকৃতির একেবারে বিপরীত দিকে স্থাপিত হইয়া পড়িয়াছেন। সমুদয় জগৎটা অমৃতলালের কেমন বিষাদময় বোধ হইতে লাগিল। তিনি আর সে গৃহে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। অধীর-

চিত্ত শান্ত করিবার জন্য সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে প্রাতঃসমীরণ সেবন করত চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেখিতে দেখিতে চারি দিক কোলাহল পূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে গৃহের তাবৎলোক শয্যা ত্যাগ করত নিত্য কার্য্যে ব্যস্ত হইল। অমৃতলাল• কলিকাতা যাইবার সমুদয় ঠিক করিয়া পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া ‘সস্নেহে মোহিনীকে দুই একটি আদরের কথা শুনাইযা ট্রেনে উঠিলেন। যথাসময কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তৎপরে বাসায় দ্রব্যাদি যথাস্থানে রাখিয়া অল্পমাত্র বিশ্রাম করত একখানি গাড়ী করিযা সত্বর বরাহনগবে গমন করিলেন। লক্ষ্যস্থানে আসিয়া দেখিলেন হীরালাল তাঁহাব বৈঠকখানায় বসিয়া তাঁহাকেই পত্র লিখিতেছেন। হীরালাল অমৃতলালকে দেখিবামাত্র অতি আনন্দ সহকারে বলিয়া উঠিলেন, “তবু ভাল, আমি বলি আমাদের একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছ। একখান চিঠিও কি লিখিতে নাই। আমি এই তোমায পত্র লিখিতেছিলাম। বাড়ীর সব ভাল ত” ? “হাঁ তা সব ভাল। এখানের সব ভাল ত ? এই বলিযা অমৃতলাল ঈষৎ হাসিলেন।

হীরালাল। “হাঁ এখানের সব ভাল। চল এখন বাড়ীর ভিতর যাওয়া যাক্”। উভয়ে অন্তঃপুর মধ্যে

গিয়া দেখিলেন উষাবতী স্বীয় কক্ষে একখানি চৌকিতে বসিয়া চিঠি লিখিতেছেন।

অমৃতলালকে দেখিবা মাত্র সহাস্য বদনে বসিতে কহিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসিতে লাগিলেন।

অমৃতলাল হৃদয়প্রতিমা স্নেহকে না দেখিতে পাইয়া শূন্য হৃদয়ে প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ মনোভাব গোপন করিতে অসমর্থ হইয়া, ভীত অন্তরে কহিলেন, স্নেহ কোথায়? হীরালাল কহিলেন "তাহার পিতার সঙ্কট পীড়া হওয়ায় তাহার খুল্লতাত আসিয়া তাহাদিগকে লইয়া গিয়াছেন"। সহসা অমৃতলালের মাথা ঘুরিতে লাগিল। মুহূর্ত্তের মধ্যে সেই ভয়ানক স্বপ্নবৃত্তান্ত পূর্ণাকারে তাঁহার ব্যথিত হৃদয়ে উদয় হইল। অনেক ক্ষণ অবধি অমৃতলালের কথা কহিবার শক্তি রহিল না। অনেক ক্ষণ অবধি কত ভাবে কত ভাবনার স্রোত তাঁহার সন্তপ্ত হৃদয়ে ক্রমান্বয়ে বহিয়া গেল। অমৃতলাল সহসা পরিস্কার রূপে আপন অদৃষ্টের পরিণাম বুঝিতে পারিলেন। মানুষ একটা স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে কতক পরিমাণে আশ্বস্ত হয়। অমৃতলাল কিছু পরিমাণে প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিলেন "কত দিন গিয়াছেন"?

হীরালাল। "প্রায় দুই মাস হইল। বাবা স্বয়ং

তাঁহাদের আনিতে যাইবেন বলিয়া বোট ঠিক করিয়াছেন। আমি অনেক করিয়া বলিয়া কহিয়া তাঁহার যাওয়া বন্দ করিয়াছি। আমিই কল্য তাঁহাদের আনিতে যাইব। কি বলিব ভাই! চিঠিখানা পর্য্যন্ত তাঁহাদের লিখিতে দেয় না, বাবা লোকমুখে তাঁহাদের কষ্টের কথা শুনিয়া নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছেন। পিসিমার কষ্ট তিনি কখন দেখিতে পারেন না। আর আমাদের সংসারও পিসিমা ভিন্ন এক দণ্ডও চলে না। মা ত সর্ব্বদা পীড়িতা"।

অমৃতলাল নীরবে হীরালালের কথাগুলি শুনিতেছিলেন। ইতিমধ্যে উষাবতী দুইখানি পাত্রে নানাবিধ খাদ্য আনিয়া, আসন পাতিয়া দুইটি রৌপ্যময় গ্লাসে জল দিয়া অমৃতলালকে কহিলেন, "একটু জলযোগ করিয়া বাধিত করুন"। অমৃতলাল উষাবতীর সম্মানরক্ষার জন্য একটু শুষ্ক হাস্য করিয়া জলযোগে বসিলেন কিন্তু কিছুই খাইতে পারিলেন না। একটি পরিচারিকা রৌপ্যময় পাত্রে কতকগুলি তাম্বূল আনিয়া দিল। অমৃতলাল তন্মধ্য হইতে একটি তাম্বূল হস্তে লইয়া বিনীতভাবে কহিলেন "তবে আজ যাই"।

হীরালাল তাঁহার মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিয়া তাঁহাকে থাকিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন।

অমৃতলাল তাঁহাকে কহিলেন "অদ্য যাই তুমি ফিরিয়া আসিলে আবার আসিব"। এই বলিয়া উষাবতীর নিকট বিদায় লইয়া শকটারোহণে প্রস্থান করিলেন। তিনি প্রস্থান করিলে হীরালাল একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন "কি অকৃত্রিম ভালবাসা! কিন্তু বোধ হয় এই ভালবাসার পরিণাম বড়ই ভয়ানক"। উষাবতী হীরালালের কথার মর্ম্ম বুঝিলেন, স্নেহের সেই সুধাংশু বদনখানি মনে পড়িল। তাঁহার সেই সরলতাময় অমিয় কথাগুলি মনে পড়িল। দেখিতে দেখিতে উষার সেই কৃষ্ণ নয়ন দুটি অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। উষা শয্যায় মুখ লুকাইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে এইরূপ রোদন করিতে দেখিয়া হীরালালেরও নয়ন শুষ্ক রহিল না। পর দিন বহুলোক বেষ্টিত হইয়া, হীরালাল শ্যামা ও স্নেহকে আনিতে যাত্রা করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

লিপী।

অমৃতলাল ভগ্ন ও বিষণ্ণ হৃদযে কলিকাতায় আপন বাসায ফিরিয়া আসিলেন। সন্ধ্যা সমুপস্থিত, অমৃতলালের তৎপ্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য নাই। তাঁহার হৃদয-জগতে যে ঘোরতর আঁধার সমাগত তিনি তাহাতেই সমাচ্ছন্ন। তিনি এমন ভাবে আপনহারা হইয়াছিলেন, যে বাহ্য জগতের কোন প্রকার ভাব, কোন প্রকার ঘটনাই তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে না। তিনি আপন শয্যায় শুইয়া মৃতপ্রায় পড়িয়া আছেন। কত প্রকার চিন্তাই যে তাঁহার হৃদয় দিয়া বহিয়া যাইতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ তিনি ভাবিতেছেন তিনি মনুষ্যত্বহীন, তিনি কেন জগতে আসিলেন? তাঁহার জগতে আসিবার উদ্দেশ্য কি? তাঁহাকে দিযা জগতের কোন কাজই হইতে পারিবে না, তাঁহাব ত কোন প্রকার শক্তি সামর্থই নাই। আবাব ভাবিলেন সত্যই কি আমার শক্তি নাই? না তাহা ত নয়, আমার যে অনেক শক্তি, অনেক তেজ, অনেক উদ্দেশ্য। স্নেহের সেই বিমল মুখচন্দ্র ধীরে ধীরে তাঁহাব হৃদয়পটে উদয় হ-

ইল। তাঁহার সেই মধুমাখা কথাগুলি একে একে মনে হইতে লাগিল। তাঁহার সেই সরলতাময় ভাবগুলি হৃদয়ে উপস্থিত হইল। তাহার পর মনে হইল এই সুধাময়ী স্নেহ এখন আর তাঁহার নয়। তিনি এখন কোন সৌভাগ্যবান পুরুষের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন। অমৃতলাল অধীর হইয়া পড়িলেন। পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে তাঁহার যে শক্তিটুকু সঞ্চয় হইয়াছিল, যে সাহসটুকু পাইয়াছিলেন তাহা একেবারে বিলুপ্ত হইল। তৎপরে সরোদনে ক্ষিপ্তের ন্যায় বলিতে লাগিলেন, স্নেহ—আমার, তুমি আমাব বল, তুমি আমার শক্তি, তোমা ছাড়া যে আমি কিছু না, তবে তোমা বিহীনে আমি কি করিয়া তিষ্ঠিব? এই কথা কয়টি উচ্চারণের পরক্ষণেই কে যেন অতি মধুব স্বরে বলিল "শান্ত হও প্রকৃতিস্থ হও, কি করিতেছ? এই কি তোমার উদ্দেশ্য? শুনিবামাত্র তাঁহার নবজীবন সঞ্চার হইল। আবার তাঁহার সাহস আসিল, শক্তি অসীম, তেজ অসীম, তখন তিনি আপনাকে আপনি ধিক্কার দিলেন। তিনি আপনার হীনতা অনুভব করিয়া লজ্জিত হইলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন, এই না আমি ভাবিয়া থাকি আমার প্রেম স্বার্থশূন্য! ছিঃ, অমন স্বর্গের দেবীকে আমি পার্থিব সুখেব জন্যই এত দিন ভাল বাসিয়া আসিয়াছি? ধিক্ আমাকে।

স্নেহ অন্যের হইয়াছে হউক, তাহার পার্থিব শরীর মাত্র অন্যের হইয়াছে কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি তাহার পবিত্র আত্মা কথনই অন্যের হইবার নয়। আমার স্নেহ আমারই আছে, অনন্তকাল আমারই থাকিবে। ছিঃ, আমি এত অধীর হইয়া পড়িয়াছি। আমি এত দুর্ব্বল! প্রভু পরমেশ্বর তোমার সেবককে রক্ষা কর, তোমারই উপর নির্ভর করিতে ও তোমার কাজ করিতে শক্তি দেও। পুনরায় তাঁহার শক্তি আসিল। তিনি কি যেন একটা বলে বলীয়ান হইয়া সহসা স্থির ও প্রকৃতিস্থ হইলেন। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিলেন রাত্রি এক প্রহর অতীত হইয়া গিয়াছে। পার্শ্বে একটি বাতী জ্বলিতেছে। তিনি ধীরে ধীরে উঠিয়া হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আসনে উপবিষ্ট হইয়া একাগ্রচিত্তে আপন বাদ্য যন্ত্র এস্রাজটি ধীরে ধীরে বাজাইতে লাগিলেন, ও তৎসঙ্গে আপন সুমিষ্ট স্বর মিলাইয়া হরিগুণ গানে মত্ত হইলেন। গাহিতে গাহিতে তাঁহার বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতি ভাসিয়া উঠিল, দুই চক্ষুবাহী প্রেমাশ্রু দেখা দিল, সর্ব্বশরীর রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল, থামিয়া থামিয়া পুলকে হৃদয় নৃত্য করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কি এক অপূর্ব্ব ভাবে অমৃতময় প্রেমরস পানে তিনি বিভোর হইয়া পড়িলেন। ক্রমে ক্রমে গীত

ক্ষুধা মৃদু হইতে মৃদুতর হইয়া আসিল। হস্তের শিথিলতা প্রযুক্ত হস্তস্থিত যন্ত্র খসিয়া পড়িল। অশ্রুসিক্ত নয়নদ্বয় ক্রমে শুষ্ক হইল। কেবল সেই আয়ত নয়নযুগল কি এক অব্যক্ত প্রেমভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে অমৃতলাল অমৃতময়ী মার প্রেমামৃত পানে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। কে জানে কি ভাবে তাঁহার পবিত্র মুখারবিন্দে হাস্যের দেখা দিল। কে জানে কতক্ষণ তিনি এইরূপ ভাবে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন তৎপর সবলচিত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক যেমন ঝড়ের পর প্রকৃতি স্থির ভাব ধারণ করে সেই রূপ স্থিরতা অবলম্বন পূর্ব্বক কক্ষমধ্যে পাদচালনা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

গৃহের এক পার্শ্বে একখানা মেজ, তন্মধ্যে কতকগুলি পুস্তক ও লিখিবার উপকরণ রহিয়াছে এবং বসিবার একখানা চেয়ার ছিল। অমৃতলাল ধীরে ধীরে সেই চেয়ারখানিতে উপবেশন করিলেন। একখানি কাগজ লইয়া কি লিখিলেন, তার পরে কি মনে করিয়া কাগজখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। অনেক ক্ষণ বসিয়া কি চিন্তা করিতে লাগিলেন। পুনর্ব্বার এক খানি কাগজ লইয়া লিখিতে আরম্ভ করিলেন, লিখিলেন,

"আমার স্নেহ!

তুমি কি এখন আর আমার নও? কে বলিল

তুমি আমার নয়? অনেক চেষ্টা করিয়া ত আমি ভাবিতে পারি নাই যে তুমি এখন আমার নও, অন্যের। তুমি অন্যের তাহা কেন ভাবিতে পারি না, তাহা আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। স্নেহ! সত্যই কি এখন তুমি অন্যের হইযাছ? তুমি ভিন্ন কে আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিবে? যদিই বা তুমি অন্যের হইয়া থাক তাহাতেই বা আমার কি? আমি ত চিরকালই তোমার, চিরকালই ভাবিব তুমি আমার। আমি ত জানি সর্ব্বসাক্ষী মঙ্গলময ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমাদের পরিণয হইযা গিযাছে। তুমি আমারই, আমি তোমারই। আঃ! কি লিখিতে কি লিখিতেছি। স্নেহ! আমি জানি তুমি আমাকে অতিরিক্ত স্নেহ কর, তুমি আমাকে যারপর নাই প্রেম কব, আমি অতি সৌভাগ্যবান। এ জগতে যদি আমার কিছু স্পৃহনীয় থাকে তাহা তুমি, যদি কিছু আনন্দের বিষয় থাকে তাহা তোমার সুধাংশু-বদন, যদি কিছু সুখ থাকে তাহা তোমার হাস্যমিশ্রিত মধুমাখা কথা। জানি না আমি অদ্য যে বিষযে অনুবোধ কবিতে বসিয়াছি তাহা তোমার প্রীতিপ্রদ হইবে কি না? তাহা তুমি অন্তরের সহিত অনুমোদন করিবে কি না? তাহাতে তোমাব মর্ম্মে আঘাত লাগিবে কি না? কিন্তু কি

করিব? তোমার প্রতি অচলা স্নেহ, তোমার মঙ্গলে অন্তরের একান্ত অনুরাগ, তোমার সুখই আমার সুখ প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্বন্ধ সমুদায় আজি এক বাক্যে আমায় পরামর্শ দিতেছে তাই আজ আমি না লিখিয়া থাকিতে পারিলাম না।

স্নেহ! আমি অতি কাতর চিত্তে তোমায় বলিতেছি আমায় সুখী করিবার জন্য তুমি মনকে দৃঢ় কর। আমি মনকে দৃঢ় করিয়াছি। মনকে দৃঢ় কর বলিতেছি—কিন্তু বড় কঠিন। স্নেহ! আমি বিশ্বাস করি তুমি আমার সুখের জন্য সকলি করিতে পার। স্নেহ! আমার অনুরোধ রক্ষা করিয়া আমায় সুখী করিবে না? তোমায় যে অনুরোধ করিব বলিয়া এত লিখিলাম, কৈ তাহা এখনও লিখিতে পারিলাম না কেন? মুহুর্মুহু বড় ভয় হইতেছে, পাছে তোমার কোমল হৃদয়ে আঘাত লাগে। স্নেহ! তুমি যে পুষ্প হইতেও কোমল। কিন্তু আবার ভাবি তুমি আমার জন্য পর্ব্বতাকার ক্লেশরাশিও অক্লেশে কুসুম-কোমল হৃদয়ে বহন করিতে পারিবে।

স্নেহ আমার, তুমি আমার জন্য ভাবিও না, তুমি সুখী হইলেই আমি সুখী হইব। তুমি আমার অনুরোধ শুন, চিত্ত সুস্থির করিয়া যে সৌভাগ্যবান পুরুষের মনোমোহিনী হইয়াছ বা হইবে সদা তাঁহার মন-

স্তুষ্টি করিতে প্রযাসিনী হইবে। সদা তাঁহাকে প্রেমনয়নে দেখিবে, হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে প্রেম করিবে। যখন শুনিব আমার ইচ্ছানুরূপ কাজ করিতেছ, তখন আর আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। তুমি আমার জন্য এক বিন্দুও উদ্বিগ্ন হইও না। আমি নিশ্চয় বুঝিয়াছি এ জগতে আমাদের সম্মিলন হইবে না। জানি না মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কি মঙ্গল উদ্দেশ্য ইহার মধ্যে নিহিত আছে। হইতে পারে আমার স্পর্শে তোমার বুঝি কি অমঙ্গল ঘটিত। তোমা অপেক্ষা এ জগতে আমার কি প্রার্থনীয় হইতে পারে? তুমি একবার মনে কর দেখি, আমি হৃদয়কে কি অবস্থাপন্ন করিয়া তোমায় এইরূপ অনুরোধ করিতেছি। তুমি আমাকে স্মরণ করিয়া কোন প্রকারে অসুখী হইও না। আমি বেশ থাকিব, যাঁহার প্রসাদে আমরা এই অমূল্য প্রণয়রত্ন লাভ করিয়াছি, যে সিদ্ধিদাতা ঈশ্বরের সাক্ষাতে আমরা হৃদয়ে হৃদয়ে পরিণীতা হইযাছি, তাঁহার কৃপায় আমরা অবশ্যই পরলোকে নীত হইয়া অপার আনন্দে ভাসিব। কিন্তু তুমি যদি আমার এই অনুরোধ রক্ষা না করিয়া মর্ম্মপিড়ীতা হও এবং অসুখে ইহজীবন যাপন কর তাহা হইলে নিশ্চয় আমি এক দিনের জন্যও সংসারে সুখী হইতে পারিব না। আমি যখন শুনিব তুমি

একটি সুশীল পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়াছ; আর যখন শুনিব সেই সৌভাগ্যবান তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসেন তখন আমার আনন্দের সীমা থাকিবে না। আর কি বলিব স্নেহ! অভাগার শেষ অনুরোধ রক্ষা করত মনস্থির করিয়া পতিসেবায় রত হও। কালের বিচিত্রগতি! এক দিন, সেই এক দিন তুমি আমায় এই রূপ উপদেশ দিয়াছিলে, তাহা আমি হাস্য করিয়া উড়াইয়া দিয়াছিলাম। ঘটনাক্রমে আজ তোমাকে সেইরূপ উপদেশ শুনিতে হইতেছে। স্নেহ! তুমি মনে করিও না, আমি অল্প কষ্টে তোমাকে এইরূপ উপদেশ দিলাম। আমি কি অল্প কষ্টে মন দৃঢ় করিয়াছি? আর বেশি কি লিখিব। তুমি বুদ্ধিমতী, বুঝিয়া মন স্থির করিয়া সংসারব্রতে ব্রতী হও ত সুখী হইবে ও আমায় সুখী করিবে, এই এক মাত্র শেষ প্রার্থনা। মঙ্গলময় ঈশ্বর তোমায় সুখী করুন। বিদায় ইতি।

তোমারই অমৃত—

অমৃতলাল চিঠিখানি মুড়িয়া শিরোনামা লিখিলেন। তৎপরে দ্বারবানকে ডাকিয়া তৎক্ষণাৎ বরাহনগর হীরালালের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ভৃত্য আসিয়া বলিল আহার প্রস্তুত। অমৃতলাল মাথা নাড়িয়া আহারে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন।

ভৃত্য বলিল খাইবেন না কেন কোন অসুখ হইয়াছে কি ?

অমৃতলাল মাথা নাড়িয়া বলিলেন "না"। ভৃত্য বলিল "তবে কিছু খান"। ভৃত্য অমৃতলালকে বড়ই ভালবাসিত। তাঁহার অদ্যকার ভাব দেখিয়া তাহার বড় ক্লেশ হইতেছিল। অমৃতলাল ধীরে ধীরে একবার তাহার প্রতি দৃষ্টি করিলেন। তার পর কহিলেন "দুগ্ধ আনিয়া দাও"। ভৃত্য সত্বর দুগ্ধ গরম করিয়া আনিয়া দিল কিন্তু আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাহার সাহস হইল না। সে চলিয়া গেলে অমৃতলাল সেইখানে বসিয়া রহিলেন। নিকটস্থ ঘড়িতে এক দুই করিয়া বারটা বাজিয়া গেল। অমৃতলাল একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক শয্যায় শয়ন করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

অধীব শ্যামা।

যদুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী আজ তিন চারি দিবস অবধি বড় ধুমধামে পূর্ণ হইয়াছে। চতুর্দ্দিক হইতে আত্মীয় কুটুম্ব সকল আসিতেছে। স্ত্রীলোক-দের আমোদ আহ্লাদে ঝগড়া বিবাদে বাড়ী কম্পা-ন্বিত হইতেছে। এক স্থানে কতকগুলি স্ত্রীলোক মণ্ডলাকারে অত্যুচ্চস্বরে মঙ্গলসূচক গান গাইতেছে। এ দেশের কোন প্রকার মঙ্গলকার্য্যে দশ পনর দিন পূর্ব্ব হইতে স্ত্রীলোকেরা প্রাকাশ্য ভাবে এই রূপ গান গাইয়া থাকেন। এক স্থানে কতকগুলি স্ত্রীলোক রন্ধনের নানা প্রকার আয়োজন কবিতেছে। এক স্থানে একটি যুবতী কতকগুলি শিশুকে আহার করা-ইতেছে, কোন কোন শিশুর উদরপূবণ হইযাছে, পবে যাহা মুখে দিতেছে তাহাই বমন কবিবার উপক্রম করিতেছে, কেবল যুবতীর করপদ্মের প্রহাবের ভয়ে অতি কষ্টে উহা উদবস্থ করিতেছে। তিন চারি জন রন্ধনকারিণী বমণী নানা প্রকাব ভক্তিসহকারে রন্ধন করিতেছে। ঘর্ম্মসিক্ত কলেবরে গোযালাগণ ভারে ভারে দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর প্রভৃতি বহন করিতেছে।

চারিদিকেই আন আন, নাও, দাও, খাও, ইত্যাদি শব্দ এক প্রকার প্রীতিভাব প্রকাশ করিতেছে। ইতিমধ্যে একখানি পাল্কি আসিয়া বহির্ব্বাটিতে থামিল। বাড়ীর ভিতরে সংবাদ আসিল নিরূপমের দ্বিতীয় স্ত্রী আসিযাছে। ইহা শুনিয়া একজন বৃদ্ধা দ্রুত বৌ তুলিতে গেল। সঙ্গে বালক বালিকার দল ছুটিল। বৃদ্ধা নববধূকে পাল্কি হইতে উঠাইয়া বাড়ীর মধ্যে আনিল। নববধূর আগমনে কতকগুলি স্ত্রীলোক একত্র হইয়া চারিদিক কাঁপাইয়া হুলুধ্বনি করিতে লাগিল। গিরিবালা ও স্নেহ একটি ঘরে বসিয়াছিলেন। গিরি জানিত তাহার সপত্নীকে আনিতে যাওয়া হইয়াছে। এই হুলুধ্বনিতে তাহার আগমন জানিয়া তাহাকে দেখিতে দৌড়িল। স্নেহ তাহার এই সরল ভাব দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার সঙ্গে চলিল। গিরি সতীন দেখিযা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, কারণ, সতীন দেখিতে অতি কুৎসিত, নিরূপম অপেক্ষা অনেক বড়, একগলা ঘোমটা দিয়া একটা তালগাছের মত দাঁড়াইয়া আছে। স্নেহ হাসিতে হাসিতে গিরিকে বলিল, হাসিস্ কেন্ লা? সতীন দেখিয়া কি হাসিতে হয়? "দেখ বৌ তোমার সতীন তোমায় দেখিয়া হাসিতেছে তুমি নিরু দাদাকে বলিয়া দিও"। নববধূ লম্বিত-ঘোমটা হ-

ইতে সকোপ নয়নে সতীন দেখিতে লাগিল। নূতন বধূর ভার স্নেহের উপর অর্পণ করিয়া সকলে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে রত হইল।

পরশ্ব স্নেহের বিবাহ। সকলেই মহা আনন্দে মহা উৎসাহে কাজ কর্ম্ম করিতেছেন। আর সেই অভি-মানিনী শ্যামা কি করিতেছেন? তিনি একখানি গৃহে শয়ন করিয়া অবিরল অশ্রুধারে উপাধান সিক্ত করিতেছেন। তাঁহার সেই স্থূল ও জ্যোতিপূর্ণ দেহ কালি বর্ণ ও কৃশ হইয়া গিয়াছে। হঠাৎ দেখিলে শ্যামাকে চেনা যায় না। শ্যামা স্নান না করিলে স্নেহ স্নান করে না, শ্যামা না খাইলে স্নেহ খায় না তাই শ্যামা অনিচ্ছাসত্ত্বেও স্নান আহার করে। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীত হইযা গিয়াছে, শ্যামা এখনও হস্ত মুখ প্রক্ষালন করেন নাই। একজন রমণী আসিয়া শ্যামাকে স্নান করিবার জন্য ডাকিল। রমণী একবার দুইবার ক্রমান্বযে তিন চারিবার ডাকিল কিন্তু শ্যামার উত্তর নাই। রমণী মনে করিলেন শ্যামা বুঝি নিদ্রিতা, গাত্রে হাত দিয়াই রমণী শিহ-রিয়া লঠিল, শ্যামা অচৈতন্য। রমণী দ্রুত এই সংবাদ সকলকে জানাইল। সকলে অতি দ্রুত সেই গৃহে প্রবেশ করিল। স্নেহেব নিকটও এই সংবাদ পৌঁছিল। স্নেহ উন্মাদিনীর ন্যায় দৌড়িযা সেই

গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক মাতার বক্ষঃস্থলে মুখ রাখিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে অবিশ্রান্ত মা, মা, বলিয়া ডাকিতে লাগিল। স্নেহের তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া এমন কেহই নাই যে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারে। ইতিমধ্যে যদুনাথ আসিয়া নানা প্রকার শুশ্রূষায় প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপ অনেক ক্ষণ অবিশ্রান্ত শুশ্রূষার পর শ্যামার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি ক্রমে ক্রমে নয়ন উন্মীলন করিলেন। তাহা দেখিয়া স্নেহের আর আনন্দের সীমা রহিল না। শ্যামাকে সচেতন দেখিয়া গৃহস্থিত সকলে স্ব স্ব কার্য্যে চলিয়া গেলেন। শ্যামাকে পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিতে দেখিয়া স্নেহ অশ্রুমার্জ্জন পূর্ব্বক সোহাগ পূর্ণ স্বরে কহিলেন "মা এখন কি অসুখ করিতেছে?" শ্যামা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন "ভগবান, আমি কেন চেতনা পাইলাম?" স্নেহ সরোদনে কহিলেন "কেন মা আমি কি অপরাধ করিয়াছি?" আমাকে ছাড়িয়া যাইতে কি তোমার একটুকুও কষ্ট হইবে না?" শ্যামা অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন "মা তুই যে আমার সর্ব্বস্বধন! ওঃ সেই দিন যে দিন তোকে পৃথিবীর সমুদয় সুখে বঞ্চিত করিবে সেই দিন আমি কি জীবিতা থাকিব? আমার কি কেহ নাই যে এই বিপদ হইতে আমায় রক্ষা করিবে? ওঃ কেন আমার চেতনা হইল?" স্নেহ

বুদ্ধিমতী, মাতার সান্ত্বনার জন্য বস্ত্রে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ধীরে ধীরে কহিলেন “মা! তুমি কি জান না আমি এখন কোন সুখেরই আশা করি না। এখন তোমাদের সুখই আমার একমাত্র সুখ। তোমাদের এই রূপ কষ্ট দেখিলে আমি এক দিনের জন্যও সুখী হইতে পারিব না।”

মাতা কন্যার এই অপরিসীম ধর্ম্মজ্ঞান, ও অপূর্ব্ব আত্মসুখ বিসর্জ্জন প্রভৃতি স্বর্গীয় ভাব দেখিয়া আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলেন না। আপনাকে রত্নগর্ভা মনে করিয়া, স্নেহের অমীয়মাখা কথা গুলি শেষ হইতে না হইতে তাহাকে আপনার বক্ষে চাপিয়া অবিশ্রান্ত নয়নজলে স্নেহের সুন্দর কেশজাল সিক্ত করিতে লাগিলেন। এইরূপে অবিরল রোদন করিতে করিতে শ্যামা পুনর্ব্বার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। স্নেহ মা, মা, বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। যদুনাথ এতক্ষণ পর্য্যঙ্কের এক পার্শ্বে বশিয়া গণ্ডদেশে হস্ত সংলগ্ন পূর্ব্বক কি চিন্তা করিতেছিলেন। শ্যামার চৈতন্য বিলোপ দেখিয়া ব্যস্ততা সহকারে তাহার শুশ্রূষায় রত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে শ্যামার চৈতন্যোদয় হইল। কিন্তু এবার আর শ্যামার কথা কহিবার শক্তি নাই। একে অতিশয় কৃশ দুর্ব্বলশরীর তাহাতে ক্রমান্বয়ে দুইবার মূর্চ্ছায় শ্যামা অতি-

শয় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। স্নেহ শীঘ্রগতি দুগ্ধ আনিয়া অতি যত্নে ধীরে ধীরে মাতার মুখে প্রদান করিতে লাগিলেন। মাতাকে কিঞ্চিৎ সুস্থ ও সবল দেখিয়া স্নেহের মনে সাহস হইল। স্নেহ মনের কথা প্রকাশ করিতে ভালবাসিতেন না, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন মনোভাব প্রকাশ করিলে কোন ফল হইবে না। বালিকা সহিষ্ণুতায় বুক বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু আজ মাতার ক্লেশ দেখিয়া মাতৃবৎসলা স্নেহ স্থির থাকিতে পারিলেন না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত দুইখানি দিয়া মাতৃবৎসলা স্নেহ, পিতার চরণদ্বয় বেষ্টন পূর্ব্বক কম্পিত কণ্ঠে সরোদনে বলিতে লাগিলেন, "বাবা আমি তোমার অতি স্নেহের কন্যা, আমার একটি মাত্র প্রার্থনা পূর্ণ কর, আমি আব মার কষ্ট দেখিতে পারি না। আমি চির জীবন তোমাদের চরণসেবা করিয়া কৃতার্থ হইব, আমার বিবাহ দিও না। আমার এই বিবাহ হইলে আমি মাকে কখন বাঁচাইতে পারিব না। আর তুমি ত জান আমি সর্ব্বসাক্ষী ঈশ্বরেব নিকট পরিণীতা হইয়াছি"। স্নেহের কথা শেষ হইতে না হইতে নির্ম্মম পিতা সজোরে পদদ্বয় ছাড়াইয়া ক্রোধে স্ফীত হইয়া গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। আহা! সেই ননীর পুত্তলী পিতার চরণাঘাতে পড়িয়া গেলেন।

তিনি পড়িয়া গিয়াছেন মাতা পাছে দেখিতে পান এই আশঙ্কায় দ্রুত আসিয়া মাতার পার্শ্বে বসিলেন। শ্যামা পশ্চাৎ ফিরিয়াছিলেন এই হৃদয়বিদারক দৃশ্য দেখেন নাই। স্নেহকে নিকটে দেখিয়া কহিলেন নির্দ্দয় গিয়াছে ? ওঃ কি নিষ্ঠুর !

স্নেহ। "মা বাবাকে অমন কথা কেন বল, তাঁহার কিছু দোষ নাই।

শ্যামা। "কি অমন কথা বলিব না ? তাঁর দোষ নাই ? সে কি তোর পিতা ? সে তোর ভয়ানক শত্রু, সে তোর সর্ব্বনাশের মূল। তাঁহাদের এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে এমন সময় নিরূপমের মাতা শ্যামার আহার্য্য আনিয়া স্নানাহারের জন্য যত্ন করিতে লাগিলেন। শ্যামা না খাইলে স্নেহ খাইবে না বলিয়া শ্যামা কিঞ্চিৎ মুখে দিলেন। স্নেহ মাতার ভোজনাবশিষ্ট অল্প আহার করিয়া মাতার পার্শ্বেই বসিয়া রহিলেন। আজ আর মাতার চক্ষের অন্তর হইতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

মধুর মিলন।

গ্রীষ্ম কাল, বেলা শেষ হইয়াছে তবুও পৃথিবীর উত্তাপ বিদূরিত হয় নাই। সমুদায় প্রাণীই কেমন এক আকুলভাবে সময় যাপন করিতেছে। গাছের ডালে পাতার আড়ালে নানা প্রকার পাখীগুলি নানা প্রকার আকুল স্বরে ডাকিতেছে। দুই একটি ভ্রমরা গম্ভীর স্বরে ডাকিতে ডাকিতে যেন কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। দূরে পাপিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে সপ্তম স্বর চড়াইতেছে। থাকিয়া থাকিয়া দুই দল কোকিল দুই দিক কাঁপাইয়া মধুর ঝঙ্কারে আকুল করিতেছে। নীলাকাশে শ্বেতপর্ব্বতাকার মেঘস্তূপ, উচ্চ বৃক্ষের মস্তকোপরি থাকিয়া জগতে উঁকি মারিতেছে। তেজোময় বৃক্ষগুলি কেমন যেন শুষ্কতা প্রকাশ করিতেছে ও তত্রস্থ পত্রগুলি ঈষৎ বায়ুভরে ঈষৎ হেলিয়া দুলিয়া যেন কাহারও নিকট সরসতা ভিক্ষা করিতেছে। পুষ্পবৃক্ষের নানা রঙ্গের সৌরভময় পুষ্পগুলি কোমল বস্তু যে কঠিনতা সহিতে পারে না ইহাই প্রকাশ পূর্ব্বক বৃক্ষতলে পতিত হইয়া বৃক্ষের সৌন্দর্য্য বিলোপ করিতেছে। সন্ধ্যা দেবী

কখন শীতলতা লইয়া জগতে আগমন করত স্নিগ্ধতা বিতরণ করিবে সকলে উৎসুক চিত্তে ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছে। বিস্তৃতা চঞ্চলা পদ্মা নদী এখন স্থির, কেবল তাহার বিশাল বক্ষে মুহূর্ত্তের মধ্যে আকাশ-স্থিত মেঘমালার ছায়া আসিয়া পড়িতেছে। আবার মুহূর্ত্তের মধ্যে পরপারের গাছের মাথার উপর দিয়া ধান্যক্ষেত্রের উপর দিয়া অতি দ্রুত চলিয়া যাই-তেছে।

ক্রমে ক্রমে দিনকর আপন তেজ আকর্ষণ পূর্ব্বক পশ্চিমাকাশ দিয়া পৃথিবীস্থ উচ্চ পদার্থের মস্তক আঘ্রাণ করত গমন করিল। সূর্য্যের গমনে সন্ধ্যা-দেবী ধীরে ধীরে সন্তপ্ত পৃথিবীতে পদার্পণ করিতে লাগিল। তদ্দৃষ্টে পক্ষীগণ বিদায়সূচক ঝঙ্কার পূর্ব্বক বিস্তৃত আকাশে পক্ষ বিস্তার করিয়া আপন আপন কুলায়ে গমন করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সমুদয় জগত আঁধারে ছাইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সুবিস্তীর্ণ নীলাকাশে দুই একটি করিয়া নক্ষত্রমালা ফুটিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে পুষ্পের কুঁড়িগুলি আধফুট হইল। দেখিতে দেখিতে বৃক্ষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখাগুলি, পাতাগুলি নাচিয়া উঠিল। সন্ধ্যাসমীরণ মৃদু ভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যার ছায়ার সঙ্গে

আর একখানি ক্ষুদ্র মলিন ছায়া ধীরে ধীরে পদ্মার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। স্নেহলতা অতি নির্জ্জন বৃক্ষলতাশোভিত পদ্মার তীরে আসিয়া দূর্ব্বাসনে ধীরে ধীরে উপবেশন করিলেন। হঠাৎ অসুখে সুখ আসিলে, নিরানন্দে আনন্দ আসিলে, নিরাশায় আশা আসিলে, কঠিনতায় কোমলতা আসিলে, বিষাদে হাঁসি আসিলে যেমন একটি অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হয় সেইরূপ কঠিনতাময় সংসার হইতে দূরে আসিয়া স্নেহের মন কেমন একরূপ শান্তিলাভ করিল। পিঞ্জর-পরিত্যক্ত পক্ষীর ন্যায় স্নেহ একবার আপনার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, একবার সম্মুখস্থ পদ্মার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, একবার অসংখ্যনক্ষত্রশোভিত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যময় আকাশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, কি এক সুধাময়ভাবে তাঁহার পবিত্র প্রাণটি পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত দুখানি জোড় করিয়া গদগদ চিত্তে অশ্রু ধারাবাহী নেত্রে ধীরে ধীরে মধুর স্বরে কাহার মহিমা গানে বিভোর হইয়া পড়িলেন। কে জানে কতক্ষণ তাঁহার এইরূপ মধুর ভাবে কাটিয়া গেল, হঠাৎ কি ভাবে তিনি বলিয়া উঠিলেন "অমৃত! অমৃত!! অমৃত!!! প্রাণের অমৃত! এই মধুময় সময়ে তুমি কোথায়! আর কি তোমায় দেখিতে পাইব না? একবার দেখিয়া যাও আমার ইহ জন্মের

সমুদয় সুখ অগাধ পদ্মাসলিলে নিক্ষেপ করিতেছি। তুমিও আইস এক সঙ্গে ব্রত গ্রহণ করি। না, না, তুমি এই কঠিন ব্রত গ্রহণ করিও না। তোমার প্রেমময় প্রাণ, এই কঠিন ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিবে না। তবে তুমি কি করিবে? আমার প্রাপ্য সেই স্বর্গীয় প্রেম কি অন্য ভাগ্যবর্তাকে দিবে? প্রাণেশ্বর! সর্ব্বস্ব! অমূল্যধন! তবে আমি কি আশায় কেমন করিয়া জগতে তিষ্ঠিব?" বালিকা আকুল ভাবে প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে দুই হস্তে চক্ষু মুছিয়া বালিকা ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনভূমি কাঁপাইয়া কহিলেন—"তুমি সুখী হইলেই আমি সুখী হইব। নাথ! তুমি যাহাতে সুখী হও তাহাই করিও।" কে জানে কি ভাবে বালিকার নয়ন দুইটি আবার অশ্রুপূর্ণ হইয়া আসিল। বালিকা ঊর্দ্ধনেত্রে গদ্‌গদ ভাবে কহিলেন "জানি না প্রভু এই ক্ষুদ্র জীবনের এই সন্তাপপূর্ণ ঘটনার মধ্যে গুপ্তভাবে তোমার কি মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে? এই দুঃখময় ঘটনার মধ্যে কি আবার মঙ্গল আসিতে পারে? কি জানি আমি? আমি এই অসীম ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র বালুকণা মাত্র, আমার বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান এই অসীমত্বের নিকট কিছুই নয়। তবে আমার সাধ্য

কি আমার অনন্ত জীবনের মঙ্গলামঙ্গল বুঝিতে পারি? কে বলিবে এই আশুদুঃখপূর্ণ ঘটনার মধ্যে আমার অনন্ত জীবনের মঙ্গলের বীজ নিহিত নাই? জগতে এমন কাহার সাধ্য এই বিষম সমস্যার মীমাংসা করিতে পারে? যে স্রষ্টার ইঙ্গিতে এই বিশ্বচরাচর অনবরত পরিচালিত হইতেছে এক মাত্র তাঁহারই নিকট এই গূঢ় রহস্য প্রকাশিত। মানব যতই কেন বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান গরিমায় স্ফীত হউক না তাহার কি সাধ্য স্রষ্টার একটি মাত্র রহস্য প্রকাশ করিতে পারে। তবে আমি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া মঙ্গলামঙ্গল কি বুঝিব? এই ঘটনায় আমার কি কোন মঙ্গলভাব নিহিত আছে? থাকিতে পারে। আমার এই ক্ষুদ্র জীবনে অত্যল্প কালের মধ্যে ত কত দুঃখ হইতে সুখ উৎপন্ন হইতে দেখিযাছি তবে কেমন করিয়া বলিব আমার আত্মা অনন্তকাল এইরূপ দুঃখই ভুগিবে। হয় তো এ দুঃখ নয় আমার সুখের পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত। যাঁহার ইচ্ছায় আমি সৃষ্ট হইযাছি, যাঁহার নিয়মে, যাঁহার অপার করুণায আমি রক্ষিত হইতেছি সেই করুণাময়ী মা কি আমায় চির দুঃখে রাখিতে পারেন? আর যদিই বা তিনি তাহাই করেন, তবে আমার সাধ্য কি আমি কি করিতে পারি? না, না, তাহা হইতে পারে না "আমি ত মা! তোমার দযা ভিন্ন জগতে আর

কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। না, না, মাগো আমি কিছুই জানি না, বুঝি না তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক"। "তোমারই আদেশে রহিব এ দেশে, সুখ দুঃখ যাহা দিবে সহিব"। কেবল মা একটি প্রার্থনা মাঝে মাঝে প্রসন্ন মুখে অভয়বাণী শুনাইও"। বালিকার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। বালিকা কর-যোড়ে উর্দ্ধনেত্রে আকাশপটেও কি দেখিতেছে? দেখিতেছে কৃষ্ণপক্ষের চতুর্থীর চন্দ্রমা ধীরে ধীরে বৃক্ষের মাথার উপর দিয়া মধুময হইয়া উঁকি মারিতেছে। বালিকা ব্যাকুল ভাবে কহিল "মা! ঐ চাঁদের মত প্রকাশিত হইয়া আমায় আশ্বাস দাও মা"। হরি! হরি! ও কি? মধু, মধু, মধু। "ভুবন ডুবিল সুধাসিন্ধুনীরে কি দিব তুলনা জগতে মিলে না"। কোটী চন্দ্রের স্নিগ্ধতা জিনি ভুবনমোহিনী, মধুময়ী জগজ্জননী বালিকার সম্মুখে ও কি মধুর ছন্দে ও কি মধুরবাণী শুনাইতেছে? মধুর মূরতি, মধুব ভাষা মধুর স্বর, মধুর বীণা, মধু! মধু! মধু! ধীরে অতি ধীরে কহিলেন এই যে আমি তোর সঙ্গে মা! ধৈর্য্য-ধর আর কেঁদ না।

"যে করে আমাব আশ, করি তাব সর্ব্বনাশ,
তবু যেনা ছাড়ে আশ, হই তাব দাসের দাস"।

বালিকা বিভোর আপনাহারা। ধীরে ধীরে বা-

লিকা ক্ষুদ্র কোমল পুষ্প হইয়া মায়ের বিশ্বময় চরণে লুঠাইয়া পড়িল। মা বিশ্ব সংসার কাঁপাইয়া আশীষ করিলেন "নিষ্কামী হও"। এই গাম্ভীর্য্যময় বাণীতে বালিকার চৈতন্যোদয় হইল। বালিকা মায়ের প্রসন্ন মুখ নিরীক্ষণাশায় মস্তক তুলিল কিন্তু কৈ মা ? "মা! মা! কোথায় মা ? বলিয়া অধীর হইয়া ধূলায় লুঠাইয়া বনভূমি কাঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কৈ আর কেহই ত তাহাকে সেই মধুর ভাষে সান্ত্বনা করিল না। হঠাৎ মায়ের আশীর্ব্বাদ বালিকার স্মরণ হইল। "নিষ্কামী হও"। বালিকা ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বসিল। অশ্রুজল মুছিল। বালিকা আপন মনে বলিতে লাগিল "মা আমার সঙ্গে আছেন, মা বলিয়াছেন "ধৈর্য্য ধর নিষ্কামী হও," একবার চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ কবিল, দেখিল বিশ্ব পূর্ব্বের স্বভাবেই অবস্থিতি করিতেছে। পুনর্ব্বার আকাশ পানে তাকাইল দেখিল নির্ম্মল চন্দ্রমা সমুদয় জগতে শুভ্র ও সুস্নিগ্ধ কিরণ বিতবণ কবিতেছে। দেখিতে দেখিতে এক খণ্ড কৃষ্ণ মেঘ চাঁদের উপর দিয়া দ্রুতবেগে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়া গেল। না আরও একখানি, ক্রমে আরও একখানি ক্রমাগত ঘন ঘন চাঁদের উপব দিয়া ছুটাছুটি করিতেছে। বালিকার কোমল হৃদয় যেন চাঁদের ব্যথায ব্যথিত হইতে লাগিল। বালিকা

কহিতে লাগিল "সরিয়া যাও মেঘ, সরিয়া যাও, কেন পবিত্র নির্ম্মল চন্দ্রকে ঢাকিয়া কষ্ট দাও" ? মেঘেরা বালিকার কথা শুনিল না। দেখিতে দেখিতে সমুদয় আকাশ ছাইয়া ফেলিল ও অনবরত চাঁদের উপর দিয়া দৌড়াদৌড়ি করিয়া জগতকে আঁধার করত এক দিক আশ্রয় করিল। ক্রমে বট, অশ্বত্থ, ঝাউ, কদম্ব, তাল, তেতুল প্রভৃতি বড় বড় বৃক্ষগুলি সাঁ, সাঁ, সোঁ, সোঁ, শব্দ করিয়া উঠিল, প্রবল ঝড় বহিল, সেই সঙ্গে উত্তাল তবঙ্গমালা তুলিয়া চঞ্চলা পদ্মা নাচিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে ঝড় একটু মৃদু হইল। ফোটা ফোটা বড় বড় ফোটায় বৃষ্টি আরম্ভ হইল।

বালিকা স্নেহের আজ ভয় নাই, কি ভাবে যেন আত্মহারা হইয়া জগতের এই পরিবর্ত্তনশীল অত্যাশ্চর্য্য কাণ্ড দেখিতেছেন। "কে ও উন্মাদিনীব ন্যায় ছুটিয়া আসিয়া স্নেহের গলা জড়াইয়া সরোদনে বলিতেছে, "মা তুই আমায় মারিয়া ফেল"। স্নেহ সহসা চমকিতা হইয়া ব্যস্ততা সহকারে কহিলেন "মা ! তুমি কেন এখানে ? তোমার যে অসুখ করিয়াছে।"

শ্যামা সরোদনে কহিলেন "তা কি আর মা তোর মনে আছে ? হায় ! আমিই তোর যত দুঃখের আকর, আমি মরি না কেন" ?

স্নেহ আপন মনে কহিল "দুঃখ নাই নিষ্কামী হও"। শ্যামা কহিলেন "গৃহে চল।" স্নেহ উঠিয়া মাতার হস্ত ধরিয়া ভিজিতে ভিজিতে গৃহে চলিলেন। স্নেহ আজ নূতন রাজ্যে প্রবেশ করিয়া মধুময় প্রাণে মধুময় মূর্ত্তি দেখিতেছেন, বিমল চিত্তে অনবরত সেই মধুময় গাথা শুনিতেছেন "নিষ্কামী হও"।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সপত্নীদ্বয়।

অদ্য স্নেহের বিবাহ। যদুনাথের বাড়ী আনন্দে পরিপূর্ণ। রমণীদের হাস্য গীতের ধ্বনিতে চতুর্দ্দিক পরিপূরিত। কেহ বরণডালা সাজাইতেছে, কেহ চন্দন ঘসিতেছে, কেহ কজ্জল প্রস্তুত করিতেছে, কেহ পুষ্পমালা গাঁথিতেছে। কোথাও যুবতীগণ আপন আপন অলঙ্কার পরিষ্কার করিতেছেন, কোথায়ও যুবতীগণ কেশ বিন্যাস প্রভৃতি নানা প্রকার সজ্জায় ব্যতিব্যস্ত। কোথাও কে কি অলঙ্কার পরিবেন এই লইয়া গোল বাঁধাইতেছেন। রন্ধনশালায় নানা প্রকার আহারীয় প্রস্তুত হইতেছে। সময়

সময় কর্ত্তা ব্যক্তি—পুরুষেরা আসিয়া "যথা সময যেন বিবাহের সমুদয দ্রব্য প্রস্তুত থাকে" বলিয়া সতর্ক করিযা যাইতেছেন।

গিরিবালা শাশুড়ির অনুমতিক্রমে সপত্নীকে লইয়া পুষ্করিণীতে পুষ্পপাত্র মার্জ্জিত করিতে গেলেন। মঙ্গলা (নূতন বধু) পুষ্করিণীতে উপস্থিত হইয়া আপন লম্বিত অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক খরতর বেগে সতীনের প্রতি কটাক্ষ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গিরির ক্ষুদ্র হৃদয়খানি কিছু ভীত হইল। মঙ্গলা এইরূপ কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করিযা গম্ভীব স্বরে কহিলেন "স্বামী আমার ঘরে আসেন না কেন?"

গিরি। "স্বামী সে কথা আমায় কিছু বলেন নাই। স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিও।"

মঙ্গলা। "স্বামী তোকে খুব ভাল বাসেন?"

গিরি। "বাসেন"।

মঙ্গলার লোমপূর্ণ উঁচু নিচু কপালখানি লোমশূন্য ভ্রূর সহিত কুঞ্চিত হইল, কর্ণ হইতে সমুদয় বদন তাম্রবর্ণ ধারণ করিল, ক্ষুদ্র ট্যারা চক্ষু দুটি বিস্ফারিত হইয়া অনবরত ঘুরিতে লাগিল, মুখবিকৃতির সঙ্গে সঙ্গে লম্ববান তাম্বুলরঞ্জিত দন্তপাটি বাহিব হইয়া পড়িল। মঙ্গলা ভীষণ স্বরে কহিল "তবে তুইই স্বামীকে আমার ঘরে আসিতে নিষেধ করিয়াছিস্"।

গিরি। "বরং তোমার ঘরে যাইবার জন্য কত অনুরোধ করিয়াছি"।

মঙ্গলা। "তিনি কি বলিয়াছেন"?

গিরি। "তিনি বলিয়াছেন তাঁর ভাল লাগে না"।

মঙ্গলা। "হুঁ নিশ্চয়ই তুই বারণ করিয়াছিস, তোর জন্যই আসেন না"।

গিরি একটু রাগিয়া কহিল, "তোমার নিজের জন্যই জান না। বাবা! তোমার যে চোক দেখিলে দিনের বেলাই ভয় করে। স্বামী বলিয়াছেন তোমায় দেখিলেই তাঁর জগদম্বা দিদিমা বলিয়া বোধ হয়"। এই কথা শুনিবামাত্র মঙ্গলা আপন হস্তস্থিত বাটী সজোরে আপন কপালে আঘাত করিল। দেখিতে দেখিতে উচ্চ কপাল স্তুপাকার হইয়া উঠিল। মঙ্গলা বিকট চিৎকার করিয়া উঠিল। মঙ্গলার সেই বিকট ক্রন্দন শুনিয়া সকলে সেই স্থানে দৌড়িয়া আসিল। কারণ জিজ্ঞাসা করায় মঙ্গলা সরোদনে কহিল— "গিরি আমায় এই বাটী দ্বারা মারিয়া পলাইল"।

পুষ্করিণীর নিকটেই একখানি ঘরে নিরূপম ও স্নেহ বসিয়া এই সমুদয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। গিরির নামে এইরূপ মিথ্যা দোষারোপ নিরূপমের সহ্য হইল না, শীঘ্র আসিয়া কহিলেন "রাক্ষসী তুই নিজে না আঘাত করিলি।" তন্মধ্যে একজন বৃদ্ধা

কহিল "নিরূপম তোকে বুঝি গিরি পাঠাইয়া দিল ?"

নিরূপম। "সে কেন পাঠাইবে ? আমি আর স্নেহ এই ঘরে বসিয়া সব দেখিয়াছি। ঐ রাক্ষসী তাহাকে আর ও কত কটু বলিয়াছে। মঙ্গলা এখন ভেউ ভেউ করিয়া কাঁদিতেছে আর ঘোমটা হইতে স্বামীকে শ্বশুর, শাশুড়িকে, ও আপন পিতা মাতাকে গালি বর্ষণ করিতেছে। "লম্বিত ঘোমটা হইতে অজস্র গালি দিতেছে, বৌ বড় লাজুক সুমিষ্ট স্বরে শ্বশুর, শাশুড়ি আত্মীয় স্বজনের সহিত কথা কহিলে বৌয়ের তুল্য লজ্জাহীনা জগতে নাই, "ধন্য সংস্কার ! অপর একজন বৃদ্ধা কহিল "নিরূপম তোর বড় দোয তুই কেন ওর ঘরে যাস্ না ?

নিরূপম। "ওকে দেখিলেই আমার অর্দ্ধেক প্রাণ উড়িয়া যায়। জগদম্বা দিদিমা হইতেও দুই কাটা বাড়া। ঘোমটা হইতে চাহিতেছে কি ভয়ানক চক্ষু দুটা দেখ না ?"

বৃদ্ধা। "তবে বিয়ে করেছিলি কেন ?"

নিরূপম। "আমি কি সাধ করিয়া বিবাহ করিয়াছি। বাবা ও জেঠা মহাশয় জোর করিয়া দিয়াছেন। আমি যখন বিবাহ করি তখন বাবাকে বলিয়াছিলাম আমি ওকে পরস্ত্রীর ন্যায় জ্ঞান করিব।

এখন আবার তোমরা উহাকে আনিয়া আমার মহা যন্ত্রণা বাড়াইলে এইরূপ করিলে আমি আর এখানে থাকিব না।”

বৃদ্ধা। “তুই ওকে বিয়ে করেছিলি, এখন ও যাবে কোথায় ?”

নিরূ। “আমি ওকে বিয়ে করি নাই। বাবার উপরোধে কতগুলি মন্ত্র পড়িয়াছি ও কতগুলি টাকা আনিয়া বাবাকে দিয়াছি ! ও যদি বিয়ে করে তাহা হইলে আমি সেই টাকা পুনর্ব্বার দিতে স্বীকৃত আছি।”

নিরূপমের কথা শুনিয়া সকলে হো হো করিয়া হাঁসিয়া উঠিল। নবাগত বৌ ক্রোধে অধীর হইয়া আপন ললাটে আঘাত করিতে লাগিল। নিরূপম ধীরে ধীরে আপন মনে কি বলিতে বলিতে তথা হইতে চলিয়া গেল।

বৌ কাঁদিতে কাঁদিতে শাশুড়ির নিকট কহিল “এখনই আমায় পিত্রালয়ে পাঠাইয়া দাও নতুবা আমি আত্মঘাতিনী হইব।”

শাশুড়ি বৌকে রাখিবার জন্য অনেক অনুরোধ করিলেন কিন্তু বৌ কিছুতেই সম্মতা হইল না। অগত্যা বৌকে তাহার পিতৃগৃহে পাঠান হইল।

কাহার অপরাধে এই অভাগিনী সমুদায় সুখে,

সমুদায় আশায় জলাঞ্জলি দিয়া চলিয়া গেল? কেহ কেহ বলিবেন উহার আপন স্বভাবের দোষ। কেমন করিয়া বলিব উহার আপনার দোষ? জন্মিয়া অবধি যে একটি ভাল কথা শুনে নাই, ভাল উপদেশ পায় নাই, ভাল সঙ্গে থাকে নাই, ভাল কাহাকে বলে জানে নাই, বুঝে নাই সে সচরাচর যেরূপ দেখে, যেরূপ দৃষ্টান্ত পায়, সেইরূপ হইবে না ত আর কি রূপ হইবে? তাহার আর দোষ কি? আমি তাহার দোষ বলি না। নিরূপমের কি ইহাতে কষ্ট নাই? আছে বৈ কি? সেই বা এই কষ্ট পায় কেন? কেহ বলিবেন তাহারই ত দোষ। আমি ত তাহার দোষ দেখি না। তাহার দোষ কি, সে পিতৃআজ্ঞা পালন করিযাছে। যদি সে পিতার বাক্য অবহেলা করিত তাহা হইলে তোমরা কহিতে এমন অবাধ্য ছেলে থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল। তবে দোষ কাহার? কেহ বলিবেন পিতার। তাই বা কেমন করিয়া বলি। তাহারা তোমাদের সমাজের রীতি অনুসারেই কাজ করেন। সমাজবিরুদ্ধে কাজ করিলে তোমাদের নিকট অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইবে, এমন কি তোমরা সমাজ হইতে দূর করিয়া দিবে। কোন কোন নব্য যুবক বলিবেন এমন সমাজ হইতে দূর হওয়াই শ্রেয়স্কর। ইহাদিগকে বলি তোমরা সমাজের

তিরস্কার সহ্য করিতে পার না কারণ সমাজকে ভয় কর না, কিন্তু যাঁহারা সমাজ হইতে তাড়িত হইতে ইচ্ছা করেন না, লোকগঞ্জনা সহ্য করিতে চাহেন না তাঁহাদের উপায় কি? সুতরাং উহার পিতা মাতারই বা বিশেষ দোষ কি? তবে দোষ কাহার? দোষ তোমাদের সমাজের। যত দিন তোমাদের সমাজের এই ভয়ঙ্কর দোষসমূহ না ঘুচিবে, যত দিন তোমাদের অভাগিনী স্ত্রীদিগকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান না করিবে, যত দিন এই অনুগতা স্নেহের আধার রমণীদিগকে স্নেহচক্ষে না দেখিবে, যত-দিন এই কৌলীন্য কুৎসিত প্রথা সমূলে উৎপাটিত না করিবে, যতদিন স্ত্রীদিগকে জ্ঞান ধর্ম্মে সমঅধি-কারিণী জ্ঞান না করিবে, যত দিন জ্ঞান, ধর্ম্ম দিয়া তাহাদিগকে সুমার্জ্জিতা না করিবে, যত দিন না তাহাদের প্রাণের বাঞ্ছিত স্বাধীনতা প্রদান না করিবে, তত দিন তোমাদের সুখ শান্তির সম্ভাবনা কি রূপে হইবে? তোমরা জ্ঞানবান হইয়াও বুঝিলে না কিসে তোমাদের প্রকৃত সুখ শান্তি আবদ্ধ রহিয়াছে।

আহা! সংসারের ঘোর উৎপীড়নে সদা ব্যতি-ব্যস্ত গৃহে যে একটু শান্তি পাইবে সে আশাও তোমা-দের অতি অল্প, আপন দোষে তোমরা অতি দুর্ভাগ্য।

তোমাদের সমাজের জঘন্য রীতি সকল সমূলে দূর কর। তোমাদের সংসারের সুখের মূল—দুঃখিনী রমণীদিগকে সুশিক্ষা দিয়া উপযুক্তা মাতা, ভগিনী কর—দেখিবে তোমাদের সংসারেই সদা সুখ শান্তি বিরাজ করিবে, সংসার ও ধর্ম্ম এক হইবে, সংসারে থাকিয়াই বাঞ্ছিত ধর্ম্মধন লাভ করিয়া ধন্য হইবে, এই সংসারেই স্বর্গসুখ অনুভব করিবে।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

এরই নাম কি বিবাহ?

নানা প্রকার ঘটনায় বেলা অবসান হইয়া আসিল। আজ প্রাতঃকাল হইতেই আকাশে মেঘ মেঘ। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ক্রমে মেঘ গাঢ় হইতে গাঢ়তর হইতে লাগিল। ক্রমে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতে লাগিল, কড় কড় শব্দে ঘোর রবে মেঘ ডাকিতে লাগিল। ওঃ আজ কি ভয়ঙ্কর দিন! প্রকৃতি দেবীও যেন স্নেহের পুত্তলী স্নেহলতার সুখ-সূর্য্য অস্তগত দেখিয়া অজস্র অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। কড় কড় শব্দে গম্ভীর রবে আবার মেঘ ডাকিয়া উঠিল। সাবধান! যদুনাথ সাবধানে স্বমস্তক রক্ষা

কর। যে ঘোরতর নিষ্ঠুরতায় প্রবৃত্ত হইয়াছ, তাহার ভয়ানক দণ্ড হইতে আপনাকে রক্ষা কর।

বাড়ীর মধ্যে সংবাদ আসিল বর আসিয়াছে। স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি প্রভৃতি মঙ্গলধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কম্পান্বিত করিয়া তুলিল। কেহ কেহ বর দেখিতে গেল। যাহারা শ্যামা ও স্নেহের দুঃখ কিঞ্চিৎমাত্রও বুঝে নাই তাহাবাও বলিল "ওঃ এই জন্যই শ্যামা এত দুঃখ করে। আমরা ভাবিযাছিলাম বিবাহ আনন্দের কার্য্য তাহাতে আবার দুঃখ কি? তা বর যে এমন তা ত জানি নাই"। ইহার মধ্যে যাহারা বর দেখেন নাই তাহাবা বলিলেন "কেন বর দেখিতে কেমন"? একজন রমণী কহিল "কেমন তাহা কি করিয়া বলিব? না দেখিলে বুঝিতে পারিবে না"। ভবি ঠান্‌দিদি বলিতেন "হরিমতির যে বর হইবে তাহার পায় দুইটা গোদ, গবিন্দ বৈষ্ণবের মত কাল, গোষ্ঠ বৈষ্ণবের মত ভুঁড়ি, টাকপড়া মাথায় পাকা পাকা দুই চারি গাছ চুলে তরমুজের বোঁটার ন্যায় একটি টিকি, ফোকলা দাঁতে হাসিবে আর তোব সঙ্গে কথা কহিবে। আমি সেই ছেলেবেলায় বরের কিই বা বুঝি তবু কাঁদিয়া মাটিতে গড়াগড়ি যাইতাম। তা এ বরের কেবল গোদ নাই নতুবা প্রায সবই সেই প্রকাব"।

দ্বিতীয়া রমণী। “বরের কয়টা বিয়ে শুনেছিস্”?

প্রথমা রমণী। “না, কতটা”?

দ্বিতীয়া। “এই স্নেহকে লইয়া চব্বিশটা হইল”।

প্রথমা। “তা কুলীনের এ আর এত বেশি হইল কি তবে স্নেহ যেমন মেয়ে বর একটু ছোট ও একটু সুন্দর হইলেই ভাল হইত”। তাহাদের এই রূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় নিরূপমের মাতা সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন তাঁহাকে দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত রমণীগণ স্বীয় স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। নিরূপমের মার বদনে কেন আজি বিষাদরাশি লক্ষিত হইতেছে? কেন আজ গিরি এক পার্শ্বে বসিয়া বদনে অঞ্চল ঢাকিয়া অশ্রুবর্ষণ করিতেছে? নিরূপম কেন বর আসা অবধি আপন শয্যায় শুইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিশ্বাসের সহিত ক্রন্দন করিতেছে? ইহারা যদুনাথ প্রভৃতিকে এই বিবাহ দিতে অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন, যখন জানিলেন তাঁহারা এই বিবাহে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তখন আপত্তি করা বৃথা জানিয়া নীরব ছিলেন। মনে করিয়াছিলেন জামাতাটি যদি অল্পবয়স্ক সুন্দর হয় তাহা হইলে হয় তো স্নেহ ও শ্যামা কখন না কখন শান্তি লাভ করিবেন। কিন্তু

বরকে দেখিয়া তাহাদের সে আশাও সমূলে উৎপাটিত হইল। তাই তাঁহাদের এত ক্ষোভ ও দুঃখ।

স্নেহ কোথায়? সকলকে দেখা যাইতেছে আর সেই মলিন ছায়াখানিকে দেখা যাইতেছে না কেন? সেই মমতাময়ী স্নেহের পুত্তলী আজ সারাদিন মর্ম্ম-পীড়িতা,—পীড়িতা মাতার নিকট বসিয়া আছেন। এবং ধীরে ধীরে বার বার মাতাকে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে উপদেশ দিতেছেন। মাতা আজ প্রায় হতচৈতন্যের ন্যায় শয্যায় পড়িয়া আছেন। আহা! সেই তেজস্বিনী শ্যামাকে হঠাৎ দেখিলে ভয় প্রাপ্ত হইতে হয়। ঘোর মনস্তাপের দুর্দ্দান্ত প্রভাবে রোগাক্রান্ত হইয়া শ্যামা চলৎশক্তিরহিত হইয়া পড়িয়াছেন। শ্যামার সেই উন্নত বপু শয্যায় মিসিয়া যাইতেছে। স্নেহময়ী স্নেহ পার্শ্বে বসিয়া মাতাকে নবজাত শিশুর ন্যায় সযত্নে শুশ্রূষা করিতেছেন।

নিরুপম ধীরে ধীরে সেই শয্যার এক পার্শ্বে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "স্নেহ! আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করিবে"?

স্নেহ। "বল সাধ্য থাকিলে করিব"।

নিরু। "পলাইবে"?

স্নেহ। "কেন আমি কি কোন অপরাধ করিয়াছি"?

নিরু। "অত্যাচারীর হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিবে? সময় নাই শীঘ্র বল উপায় স্থির করি"।

শ্যামার কর্ণে এই কথা প্রবেশ করিবামাত্র তিনি আনন্দে কহিয়া উঠিলেন, বাবা নিরু! তুই আমার কে? আহা চিরজীবি হও বাবা। শীঘ্র যাহা হয় একটা উপায় কর বাবা"।

স্নেহ ধীর গম্ভীর স্বরে কহিল "নিরুদা! তোমার মনে আবার এভাব আসিল কেন? এত দিনেও কি তুমি আমায় বুঝিলে না?"

নিরু। "স্নেহ! আমি জানি এ প্রস্তাব তোমার প্রীতিপ্রদ হইবে না কিন্তু তুমি একবার চিন্তা করিয়া দেখ কি ভয়ানক ব্যাপার উপস্থিত। না, না, তাহা কখনই হইবে না। আমার কথা তোমার অবশ্যই রাখিতে হইবে। তুমি প্রস্তুত হও আমি অতি সৎ উপায় স্থির করিয়াছি।"

স্নেহ। "আমার চির জীবনের সুখ ত আমি অনেক দিন পূর্ব্বেই পদ্মার অগাধ সলিলে বিসর্জ্জন দিয়াছি। এখন তুমি আমায় নূতন ভাবিতে বলিলে? নিরুদা! যে দয়াময় পরমেশ্বরের করুণায আমি পিতা মাতা পাইয়াছি পৃথিবীতে আসিয়া অবধি যাঁহাদের অসীম স্নেহে প্রতিপালিতা হইয়াছি তাঁহা-

দের ছাড়িয়া এ পৃথিবীতে আমি কোথায় যাইব? তুমি কেন আমায় এরূপ অসঙ্গত অনুরোধ করিতেছ? আর আমায় ও কথা বলিও না ভাই! আহা! মার আমার এমন অবস্থা দেখিয়া কি করিয়া তুমি এমন কথা মনে আনিলে?” বলিতে বলিতে মাতৃবৎসলা বালিকার সেই বড় বড় কৃষ্ণ নয়ন দুইটি জলে পূরিয়া আসিল। আর বলিতে পারিল না!

নিরু। “আমি পূর্ব্বে ভাবি নাই যে তুমি এতদূর করিবে। ওঃ আমি কেমন করিয়া সেই অশীতিবর্ষীয় অথর্ব্ব বৃদ্ধকে তোমার করকমল গ্রহণ করিতে দেখিব?” স্নেহ! কিছু দিনের জন্য পিতা মাতা হইতে বিছিন্ন হও। আমি যে তোমায় বলিয়াছিলাম এখানে কএক ঘর ব্রাহ্ম আছেন। তাঁহারা অতি পবিত্র লোক। আমি তাঁহাদের কাহারও বাটীতে তোমায় রাখিয়া আসি চল। তাহার পর তোমার মাতুলালয়ে পত্র লিখি। তাঁহারা আসিয়া তোমায় লইয়া যাইবেন। জেঠাইমার জন্য তুমি একটুকুও ভাবিও না! তোমার একটা উপায় হইলে নিশ্চয়ই তিনি সুস্থ হইবেন। আমি প্রাণপণে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে ত্রুটি করিব না”।

শ্যামা এতক্ষণ তাঁহাদের কথা শুনিতেছিলেন তিনি

ব্যাকুল হইয়া আগ্রহের সহিত কহিলেন "মা স্নেহ! নিরু যা বলে শোন, শীঘ্র নিরুর সঙ্গে গিয়া সেই স্থানে আশ্রয় লও মা। আর আমায় কষ্ট দিও না, আমি বেশ থাকিব, আমার জন্য কোন ভাবনা নাই"।

এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এই অবসরে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। ইতিমধ্যে নিরুর পিতা আসিয়া বলিলেন"মা স্নেহ সময় উপস্থিত। এই কথা কর্ণে প্রবেশ মাত্র স্নেহের হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল,মস্তক ঘুরিয়া উঠিল এবং সেই শীর্ণ শরীর একবার মস্তক হইতে পা পর্য্যন্ত কম্পিত হইল। পরক্ষণেই সে ভাব গোপন পূর্ব্বক নিরুপমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন"নিরুদা! মাকে দেখিও, মার নিকট হইতে কোথাও যাইও না"। এই বলিয়া সেই অসীম ধৈর্য্যশালিনী, শৌর্য্যশালিনী নারীরত্ন ভগবানের চরণ স্মরণ পূর্ব্বক অতুল পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া ধীরে ধীরে পিতৃব্যের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। শ্যামা হতচৈতন্যের ন্যায় পড়িয়া রহিলেন। নিরুপম যত্নে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন ও নানা প্রকারে প্রবোধ দিতে লাগিলেন।

স্নেহকে একখানি গৃহমধ্যে লইয়া স্নেহের খুল্লতাত অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগকে কহিলেন "তোমরা স্নেহকে বিবাহের বস্ত্রাদি পরাইয়া রাখ আমি একটু পরে আসিয়া লইয়া যাইব"।

সাহস করিয়া এতক্ষণ কেহ সাজাইতে যাইতে ছিল না, এক্ষণে তন্মধ্য হইতে একজন রমণী অগ্রগামিনী হইয়া বস্ত্রালঙ্কার চন্দন প্রভৃতি লইয়া সাজাইতে বসিল। একটি যুবতী কহিল "আহা! স্নেহের কি আর সে রূপ আছে? কেবল ঐ পাতলা পাতলা ঠোঁট দুখানিতে আর বড় বড় চক্ষুদুটিতে তাহাকে চেনা যায়।

স্নেহ ক্ষীণ স্বরে কহিল "এ বস্ত্র না ছাড়িলে কি হইবে না"? একজন বৃদ্ধা কহিল "ছিঃ ও কাপড় পরিয়া কি বিয়ে হয়"? স্নেহ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া কাপড়খানি ছাড়িলেন, অলঙ্কার প্রভৃতি আর কিছুই গ্রহণ করিলেন না। তাঁহার অনিচ্ছা দেখিয়া আর কেহ বিশেষ অনুরোধ করিল না।

পুনর্ব্বার স্নেহের খুল্লতাত আসিয়া স্নেহকে বিবাহ স্থানে লইয়া গেলেন। সম্প্রদানের সময় উপস্থিত হইল। বৃদ্ধের হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক স্নেহের সেই নবনীত ক্ষুদ্র হস্তখানি গ্রহণ করিবার সময় যদুনাথের সেই কঠিন হৃদয়ও একবার কাঁপিয়া উঠিল। তাঁহার অনুভব হইল যেন তিনি কি ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম করিতেছেন, পরক্ষণেই জামতার কুল মানের কথা মনে হইল, সম্প্রদান শেষ হইল। এই রূপে যথাবিহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

বিবাহের পর যথাবিহিত আহারাদি কার্য্যও শেষ হইয়া গেল। বৃদ্ধ বর আহারান্তে সারাদিন উপবাসে ও ক্লেশে সত্বরই শয়নের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। একটি রমণী বৃদ্ধকে লইয়া গিয়া শয়নগৃহে শয্যা দেখাইয়া দিল। বৃদ্ধ শয়ন করিবামাত্র ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িলেন। অনেকে স্নেহকে বাসর ঘরে শয়ন করিবার জন্য অনুরোধ করিল। স্নেহ বিরক্ত ভাবে কহিলেন "তোমাদের অনেক অনুরোধ রক্ষা করিয়াছি। আবার কেন কষ্ট দাও? তোমাদের কি এই জঘন্য অনুরোধ করিতে লজ্জা হয় না"? এই বলিয়া দ্রুত মাতার গৃহে, মাতার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক মাতার বক্ষে শয়ন করিলেন। মাতা প্রাণের ধনকে বক্ষে চাপিয়া কথঞ্চিত শান্তিতে নিশা অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

স্নেহ! ধন্য তোমার পিতৃমাতৃভক্তি, ধন্য সহিষ্ণুতা, ধন্য তোমার ভগবদ্ভক্তি! তুমি যে পরকালে অটল বিশ্বাস করিয়া মঙ্গলময় পরমেশ্বরের চরণে আত্ম সমর্পণ করত. ইহজীবনের সমুদয় সুখাভিলাষ অকূলপাথারে নিক্ষেপ কবিলে সেই ভক্তি বিশ্বাসের বলে, পবিত্রা স্নেহ! তোমার জন্য নিশ্চয়ই জঘন্য মনুষ্যের প্রভুত্ব রহিত, সাধু জীবনের অপার সুখের আগার, দেববাঞ্ছিত পবিত্র লোকের সমুদায়

দ্বার উন্মুক্ত রহিবে। বিশ্বাসিনী! এই পৃথিবীর কয়জন লোকান্তরে তোমার ন্যায় সুখের সাগরে ভাসিবে?

বিংশ পরিচ্ছেদ।

নির্ম্মম পিতা।

আজ বিবাহের তৃতীয় দিবস। আজ স্নেহের ফুল শয্যা। সকলেই নানা প্রকার আয়োজনে প্রবৃত্ত। ক্রমে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। আজ স্নেহ বড়ই অন্যমনস্ক। কি ভাবিয়া, কি জানি স্নেহের সেই ক্ষুদ্র শরীর খানি সময় সময় চমকিয়া উঠিতেছে। শ্যামার পীড়া বৃদ্ধি হইয়াছে। তিনি সময় সময় মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছেন। স্নেহ দিবা রাত্রের মধ্যে এক মুহূর্ত্তও মাতাব নিকট হইতে দূরে জান না। আহা! স্নেহকে দেখিলে আর চেনা যায় না। তাহার সেই কাঞ্চনবর্ণ শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিযাছে, সেই কোমলনবনীত সম দেহখানি কঙ্কালাবশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, সেই আকর্ণ নয়নের কোলে কালিমা পড়িয়াছে তবু বালিকা আপনার ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া অনুভব করিতেছে না। মাতার ব্যথায় তাহার কোমল প্রাণ বড়ই ব্যাথা

বোধ করিতেছে। মাতার পার্শ্বে বসিয়া নবজাত শিশুর ন্যায় অকুণ্ঠিত ভাবে সর্ব্বদা মাতার শুশ্রূষা করিতেছেন। মাঝে মাঝে মাতার যাতনায়, মাতার অজ্ঞাতে অশ্রুবর্ষণ করিতেছেন। সদাই তাহার মমতাময় হৃদযে ধ্বনিত হইতেছে "মা বুঝি আব বাঁচিবেন না"।

যদুনাথ ধীরে ধীরে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। ধীরে ধীরে ডাকিলেন স্নেহ! স্নেহ উত্তর করিলেন "বাবা"! যদুনাথ কহিলেন "আজ তোমার ফুল শয্যা, তোমার জন্য মেয়েরা অপেক্ষা করিতেছেন তুমি যাও আজ আমি এখানে থাকিব"। স্নেহ দুই হস্তে আলুলায়িত কেশরাশি অপসারিত করিয়া চমকিত ভাবে যদুনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহা দেখিয়া যদুনাথের নির্ভয় হৃদয়েও কি এক প্রকার ভয়ের সঞ্চার হইল। স্নেহ সরোদনে কহিলেন "বাবা এখনও কি তোমার ইচ্ছার শেষ হয় নাই? পিতঃ ক্ষমা কর আমি তোমার এ আজ্ঞা রক্ষা করিতে পারিব না"।

যদুনাথ। "যাও স্নেহ আমি বার বার বলিতেছি আমার আজ্ঞা পালন কর"।

স্নেহ। "পিতঃ আমি ত যথাসাধ্য তোমার আদেশ পালন করিয়াছি, এখন যাহা কহিতেছ

ইহাতে আমি নিতান্ত অক্ষম, আমায় ক্ষমা কর”।

যদুনাথ। “তোমায় যাইতে হইবে শীঘ্র যাও”।

স্নেহ। “বাবা! তুমি কেমন করিয়া আমায় পরপুরুষের শয্যায যাইতে বলিতেছ? পিতঃ! তোমার চরণে আমি কি অপরাধ করিয়াছি? আমায় ক্ষমা কর, আমি নিতান্তই তোমার এই জঘন্য আজ্ঞা পালনে অসমর্থা”।

যদুনাথ। “আচ্ছা আমার আজ্ঞা পালনে সমর্থা হও কিনা দেখা যাইবে” এই বলিয়া সক্রোধে গৃহ হইতে প্রস্থান করিলেন।

অল্পক্ষণ পরেই এই ঘটনা সকলে অবগত হইল। অবশেষে বৃদ্ধ বরের কর্ণেও ইহা প্রবেশ করিল। বৃদ্ধ শ্রবণ মাত্র ক্রোধে কম্পান্বিত হইযা সত্বরই স্বজন সমভিব্যহারে স্বগ্রামে প্রস্থান করিলেন।

“ছেলে মানুষ বুঝে না কত দিন আর এইরূপ করিয়া পারিবে” ইত্যাদি অনেক সুমিষ্ট বচনে সকলে বৃদ্ধকে ক্রোধ সম্বরণের জন্য অনুরোধ, তোষামোদ করিতে লাগিলেন। কিন্তু বরের কিছুতেই ক্রোধের শান্তি হইল না। সমাজে গোল বাঁধাইবে, এই অপমানের প্রতিশোধ দিবে ইত্যাদি বচনে যদুনাথ প্রভৃতিকে ভয় প্রদর্শন করিয়া গেলেন। কুলাভি-

মানী বর মহাশয় যদুনাথ হইতেও কুলে শ্রেষ্ঠ, আরও ঐ বৃদ্ধটি হিন্দু সমাজের একজন দলপতি। সমাজস্থ অনেকে বৃদ্ধকে অল্পাধিক ভয় করে সুতরাং যদুনাথেরও তাঁহার ভ্রাতাদের বৃদ্ধের এই আচরণে যে বিশেষ ভয় হইল তাহা আর বলিতে হইবে না। যদুনাথ এই সম্বন্ধে কি উপায় স্থির করিবেন ভ্রাতাদের সঙ্গে তাহাই পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের অনেক পরামর্শের পর যাহা স্থির হইল তাহা অতি ভয়াবহ। যদুনাথ প্রভৃতির পরামর্শে এই স্থির হইল যে কল্যই স্নেহকে কিছু অর্থ ও কিছু জিনিস পত্রসহ সমাজস্থ এক জন প্রধান লোক সঙ্গে বৃদ্ধের গৃহে পাঠান হইবে। তাহা হইলেই এই অর্থের লোভে এবং প্রেরিত লোকের অনুরোধে বৃদ্ধ স্নেহকে গ্রহণ করিবেন, এবং ইহাতে হয় তো স্নেহও জামতার বশ হইবেন। এইরূপ গোলমালে রাত্রি প্রায় অবসান হইল। এক জন লোক একখানি শিবিকা আনিতে প্রেরিত হইল।

স্নেহ প্রত্যহ প্রাতঃকালেই স্নান করিতেন। মাতাকে নিদ্রিতা দেখিয়া অদ্যও স্নান করিবার জন্য পুষ্করিণীতে গেলেন। আহা! অসহায়া বালিকা জানিত না আজ তাহার কি ভয়ানক দিবস সমাগত। দুঃখিনী গজেন্দ্রগমনে যেমন পুকুরের সোপানের উপর উপস্থিত হইলেন, অমনি নির্দ্দয় পিতা ও

খুল্লতাত প্রভৃতি আসিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া পাল্কিতে উঠাইলেন। আহা! মমতাময়ী স্নেহের প্রতিমা স্নেহ পিতার নির্দ্দয ব্যবহারে এবং মাতার অবস্থা স্মরণ করিয়া অজস্র ধারে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। তখনও সেই শান্ত স্বভাবা, ধর্ম্ম প্রাণা বালিকা নীরবে স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তরতম স্থান হইতে ধ্বনিত হইতেছিল "ধৈর্য্য ধর নিষ্কামী হও"। তাঁহার তৎকালীন ভাব দেখিয়া যদুনাথের নির্দ্দয় হৃদয়েও দয়ার সঞ্চার হইয়া উঠিল, তিনি কহিলেন "কি করিব মা! তুমি যে অবাধ্য।" অনন্তর বাহকেরা শিবিকা উত্তলোন করিল। তখন বালিকা কাতর স্বরে কহিল "বাবা! মাকে দেখিও, সর্ব্বদা তাঁহাকে প্রবোধ দিও।" "সে জন্য তুমি ভাবিও না মা! আমাদের ইচ্ছানুরূপ কাজ করিও।" এই বলিযা যদুনাথ প্রভৃতি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বাহকেরা হুঁ হুঁ শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল। সঙ্গীয় লোক জনেরাও পাল্কির সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। দুঃখিনী স্নেহের প্রতিমা স্নেহ এক মাত্র সম্বল দীনবন্ধু হরির চরণকমল স্মরণ পূর্ব্বক নিষ্পন্দ ভাবে নয়ন মুদ্রিত করিয়া পাল্কির মধ্যে বশিয়া রহিলেন।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

"তুমি কি আমার দাদা" ?

চৈত্রমাসে প্রথম গ্রীষ্মের আবির্ভাবে সমস্ত জীব আকুল। বেলা চারিটা বাজিয়াছে তথাচ সূর্য্যের প্রখর উত্তাপে গ্রীষ্মের অল্পতা দৃষ্ট হইতেছে না। বাতাসের নাম মাত্র নাই, কেবল সূর্য্যের তীক্ষ্ণ কিরণ ঢাকিয়া স্থানে স্থানে কৃষ্ণমেঘ সকল ধীরে ধীরে সুদূর বিস্তৃত আকাশমার্গে গমন করিতেছে। দেখিতে দেখিতে সেই ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ড সমূহ এক দিক আশ্রয় করিল। সেই বহু খণ্ড মেঘ মালা একত্রিত হইয়া চতুর্দ্দিক আঁধারে ডুবাইয়া ফেলিল। দিবসে রজনী সমাগত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে সোঁ সোঁ শব্দে বায়ু উত্থিত হইল। বোধ হইল পৃথিবীস্থ সমুদয় বৃক্ষাদি হেলিয়া দুলিয়া, মস্তক নাড়িয়া কাহারও যেন মহামহিমাময় অসীম শক্তির ঘোষণায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। চপলা সুন্দরী যেন কাহার গুপ্ত প্রেমে মত্ত হইয়া গাঢ়কৃষ্ণময় আকাশে আপন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিস্তার পূর্ব্বক ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহার পরক্ষণেই কড় কড় শব্দে মেঘ ডাকিয়া কাহার গম্ভীরতর গভীরতম

মহিমা প্রকাশ করিয়া উঠিল। বায়ুর সঙ্গে সঙ্গে পদ্মা সুন্দরী আপনার উত্তাল তরঙ্গমালা ফেনময় করিয়া অপার আনন্দে যেন নৃত্য করিয়া উঠিল। পদ্মার এখনকার এই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিলে বোধ হয় পৃথিবী বুঝি ইহার এই বিস্তৃত তরঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে অতল জলে নিক্ষিপ্ত হয়। ওঃ গুপ্ত ভাবে কি মহাশক্তি। এই ভয়ানক সময়ে পদ্মার এই তরঙ্গ সমূহ ভেদ করিয়া একখানি বোট তীরাভিমুখে আসিতেছে। এই ভীষণ তরঙ্গের মধ্যে এক এক বার যেন বোটখানি অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। ঝড়ের গতি ক্রমশঃ বৃদ্ধি দেখিয়া দাঁড়ি মাঝিরা যেন প্রাণপণে স্বস্ব কার্য্যে ব্যস্ত। এইরূপে অতি কষ্টে বোটখানি তীরবর্ত্তী হইল। বোট মধ্য হইতে একজন যুবা বাহির হইয়া আসিলেন। মাঝিরা কহিলেন "বাবু আপনি তীরে নামুন, আমাদের অদৃষ্টে যাহা আছে তাহাই হইবে। আমাদের প্রাণপণে বোট রক্ষা করিতে হইবে"। যুবা উত্তর করিলেন "তোমরা উঠিয়া বোটের কাছি ভাল করিযা বাঁধ, বোট মধ্যে থাকিও না," এই বলিয়া বোট তীরে না লাগিতেই যুবা বোট হইতে লাফাইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি লোকও নামিল। লোকটি হিন্দুস্থানী, বোধ হয় বাবুর চাকর।

যুবা তীরে উঠিয়া বায়ুর তাড়নায় মুহূর্ত্তও দাঁড়া-

ইতে সক্ষম হইলেন না। গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ক্রমে বায়ুর গতি অল্প হইয়া আসিল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়িতে লাগিল। এক ফোঁটা দুই ফোঁটা করিয়া ক্রমে ক্রমে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা যুবার মস্তকোপরি পতিত হইতে লাগিল। রজনী সমাগত, ঘোর অন্ধকারে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন, পথ দৃষ্ট হইতেছে না, কেবল মধ্যে মধ্যে চপলার চপল প্রভায় যুবা পথ দেখিয়া লইতেছেন। অনেক ক্ষণ এইরূপ গমনের পর তাঁহার বোধ হইল সম্মুখে কি একটা কৃষ্টবর্ণ পদার্থ রহিয়াছে। তাঁহারা সেইখানে কিছুক্ষণ দাঁড়াইলেন। তৎপরে বিদ্যুতালোকে দেখিলেন সেই পদার্থটা আর কিছুই নহে একখানা ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীর। যুবা সঙ্গের লোককে কহিলেন তুমি দেখিয়া আইস ঐ গৃহে কেহ আছে কিনা? ভৃত্য দেখিয়া সত্বর আসিয়া কহিলেন "মহারাজ ঘরে কেহ নাই"। যুবা মনে করিলেন যাহার গৃহ সে নাই তবে কি করিয়া তাহার মধ্যে যাইব? কিন্তু বৃষ্টিধারা হইতেই বা কিরূপে রক্ষা পাই? যুবা কোন প্রকারেই আর অনাবৃত স্থানে বৃষ্টিধারা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি মনে করিলেন "যাই কিছুক্ষণ ঐ গৃহ মধ্যে গিয়া আত্মরক্ষা করি। তৎপরে যাহার গৃহ সে আসিলে আমার অবস্থা সমুদায় তাহার নিকট খুলিয়া

বলিব। তাহা হইলেই আমার অপরাধ গ্রহণ করিবে না। আর কোন মতেই এইরূপে চলিতে পারি না"। এইরূপ স্থির করিয়া যুবক গমনে দ্রুত গমনে সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন কিন্তু অতিশয় অন্ধকার প্রযুক্ত গৃহ মধ্যস্থ কোন বস্তুই দৃষ্ট হইল না। ভৃত্য কহিল "বড় অন্ধকার, আপনি যদি অনুমতি করেন তাহা হইলে একটি বাড়ীর সন্ধান লইয়া আসি। বোধ হয় এখানে আরও গৃহস্থের বাড়ী আছে"। যুবা কহিলেন "আচ্ছা যাও শীঘ্র আসিও," ভৃত্য চলিয়া গেল। যুবা আদ্র বস্ত্রে সেইখানে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে কতকগুলি লোকের স্বর তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। দেখিলেন সেই লোকেরা সেই গৃহাভিমুখে আসিতেছে। যুবা একটু আড়াল হইয়া দাঁড়াইলেন। ঐ লোকেরা এক খানি পাল্কি লইয়া আসিতেছিল। তাহারা ঘরের ভিতরে পাল্কি নামাইয়া পরস্পর কহিতে লাগিল।

প্রথম। "দেখেছিস্ ভাই! কেমন অন্ধকার।"

দ্বিতীয়। "আমার ত ভাই এখানে দাঁড়াইতে ভয়ই করিতেছে"।

তৃতীয়। "আরে ভাই দেখ ঘরটার মধ্যে যেন কি নড়িতেছে"।

চতুর্থ। “হাঁ আর কেউ শুনিল না কেবল তুই শুনিলি, তোর এমন ভয় কেন” ?

তৃতীয়। “আচ্ছা কান পাতিয়া শোন্ দেখি কে যেন নিশ্বাস ফেলিতেছে”। কিছুক্ষণ সকলে নীরব থাকিয়া কহিল “হাঁ অন্য কেহ যেন ঘরের মধ্যে আছে বোধ হইতেছে”।

দ্বিতীয়। “বাবারে! মরিল্লাম রে, গেলাম রে, খাইয়া ফেলিল রে, কেন আমি হতভাগাদের সঙ্গে আসিয়াছিলাম রে”।

চতুর্থ। “চুপ্ পাজি, চল্, আমরা একটা লাঠী লইয়া আসি দেখি কোন খানে ভূতটা।”

তৃতীয়। “তোরা কেউ এখানে থাকিবি না মেয়েটাকে যদি ভূতে খাইয়া ফেলে ?”

প্রথম। “হতভাগা তুই এখানে থাক্ আমরা দীপ আনিতে চলিলাম”। এই বলিয়া সকলে দীপ আনিতে চলিয়া গেল। যুবা ইহাদের ডাকাইত বোধে এতক্ষণ গৃহের এক কোনে দাঁড়াইয়া ছিলেন কিন্তু যখন “মেয়েটাকে ভূতে খাইয়া ফেলিবে” শুনিলেন তখন তাঁহার আত্মপ্রকাশ করিতে ইচ্ছা হইল। কারণ যুবা ভাবিয়াছিলেন দস্যু কর্ত্তৃক কোন রমণী বিপদগ্রস্থ হইয়াছে।

ইত্যবসরে ঐ পাল্কিমধ্যস্থ রমণী দীর্ঘনিঃশ্বাস

ফেলিয়া করুণস্বরে কহিলেন "জননী এই অন্ধকার মধ্যে আবার তোমার সেই মধুময় জ্যোতি প্রকাশ কর, আবার আমায় আশ্বাস বাণী শুনাও। আমি যে তোমার অতি ক্ষুদ্র মেয়ে, এই দুর্ব্বল ক্ষুদ্র হৃদয়ে আর কত পরীক্ষা করিবে মা?" এই প্রাণস্পর্শী করুণ প্রার্থনা শুনিবামাত্র যুবা অতি দ্রুত শিবিকার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং শীঘ্র দুই হস্তে শিবিকার দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক ব্যাকুল কণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন "স্নেহ! দিদি আমার, আবার কোন্ পাষণ্ড তোমার এই অবস্থা করিল?" স্নেহ পরিচিত পরমাত্মী-য়ের সুমিষ্ট স্বর শুনিবামাত্র অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। তখন উত্তর না পাইয়া যুবা জানিলেন স্নেহ মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়াছেন। যুবা কাতর হৃদয়ে সত্বর পাল্কির মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আপনার আর্দ্র বস্ত্র হইতে জল লইয়া স্নেহের সেই শুষ্ক মুখকমলে প্রদান করিলেন।

ইতিমধ্যে যুবার ভৃত্য বাতী লইয়া উপস্থিত হইল। দীপ পাল্কিমধ্যে লইয়া যুবা শিহরিয়া উঠিলেন। কারণ তিনি দেখিলেন স্নেহলতার সেই অতুল সৌন্দর্য্যরাশি বিলুপ্ত এবং সেই কুসুমসদৃশ সুকোমল হস্তদ্বয় বদ্ধ। দুঃখ কষ্টে ধারাবাহী অশ্রু যুবার গণ্ড বহিয়া পড়িতে লাগিল, তিনি ব্যাকুল হৃদয়ে

অতি যত্নে স্নেহের চৈতন্য সম্পাদন করিয়া কহিলেন "স্নেহ! আমায় দেখিয়া কি আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছ ?" আশ্চর্য্য কি ? এই নির্দ্দয় দস্যু হস্ত হইতে উদ্ধার করিবার জন্য দয়াময় পরমেশ্বর আশ্চর্য্যরূপে আমায় এই ভয়ানক স্থানে আনিয়াছেন। ধন্য প্রভু! কোন্ ঘটনাসূত্রে যে তুমি কি কর কার সাধ্য বুঝিযা উঠে"। স্নেহ ক্ষীণ মৃদুস্বরে কহিলেন "আমি কি স্বপ্ন দেখিতেছি" ? স্নেহ আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, আবার নিমিলীত আয়ত নয়ন যুগল হইতে দুই ফোটা অশ্রু সেই শুষ্ক কপোল বহিয়া পড়িল। বালিকা ক্ষুদ্র হস্ত দুখানি যুক্ত করিয়া অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন "দয়াময় দীনবন্ধু! তোমার এত করুণা এই অধম দাসীর উপর"! "দাদা! দাদা! তুমি সত্য করিয়া বল তুমি আমার দাদা কি না" ? "দিদি আমার! তুমি চাহিয়া দেখ আমি তোমারই দাদা তোমাব কাছে বসিয়া আছি"— এই বলিযা যুবা স্নেহের ভগিনীর মস্তক আপন কোলে তুলিয়া লইলেন।

পাঠক কি চিনিতে পারিয়াছেন এই যুবক আমাদের হীরালাল। এক সপ্তাহ পর অদ্য এই দুর্য্যোগ অতিক্রম করিয়া বিক্রমপুর আসিযা পৌঁছিলেন। স্বপ্নেও যাহা কল্পনা করেন নাই সেই অভাবনীয় ব্যাপার দৃষ্টি করিলেন।

যে সমাজশিরোমণির হস্তে স্নেহকে অর্পণ করা হইয়াছিল সেই নিঃস্বার্থ মহোদয় মেঘ বৃষ্টি দেখিয়া এক গৃহস্থের বাড়ী আশ্রয় লইয়াছিলেন। এখন ঝড় বৃষ্টি থামিয়া আসিয়াছে দেখিয়া শিরোমণি মহাশয় আস্তে আস্তে অগ্রসর হইতেছিলেন। পথে দীপ হস্তে চারি জন বাহককে দেখিয়া স্নেহকে সেই ভূতময় স্থানে একাকী ফেলিয়া আসার নিমিত্ত শালা পাজি ইত্যাদি বলিয়া সত্বর অগ্রসর হইতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু উপদেবতার ভয়ে আপনি সকলের পাছে চলিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই সকলে সেই ক্ষুদ্র কুটীরে আসিয়া পৌঁছিল। এবং হীরালালকে সেই খানে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া অগ্নি-অবতাররূপে কটূক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ও স্নেহের প্রতি রোষপূর্ণ কটাক্ষপাত পূর্ব্বক অশ্লীল বাক্য প্রয়োগ করিয়া নানা প্রকার ভয় প্রদর্শন করিতে ও শাশাইতে লাগিলেন।

হীরালাল গাম্ভীর্য্যপূর্ণ স্বরে কহিলেন "চুপ কর দ্বিতীয়বার ঐরূপ কদর্য্য কথা বলিও না অপমানিত হইবে"। শিরোমণি মহাশয় যমদূতের ন্যায় হিন্দুস্থানী চাকরকে দেখিয়া ভীত হইলেন।

তখন স্নেহ কহিলেন "ইনি আমার দাদা আপনি কিছু মনে করিবেন না"। এইরূপ কথা বার্ত্তা হই-

তেছে ইতিমধ্যে বোটের মাঝিরা এবং হীরালালের অন্যান্য চাকরেরা তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া হীরালাল কহিলেন "বোট নিরাপদে আছে ত"? মাঝিরা কহিল "আজ্ঞে হাঁ বোট নিকটেই আনা হইয়াছে"।

হীরালাল কহিলেন "এই পাল্কি লইয়া বোটে চল"।

শিরোমণি। "আপনি কোথায় পাল্কি লইয়া যাইবেন? স্নেহ যে বলিতেছে আপনি তাহার ভ্রাতা তাহারই বা প্রমাণ কি? আপনি পাল্কি লইয়া যাইতে পারিবেন না। আপনাকে ভদ্র লোকের মত দেখাইতেছে, কেন ভদ্র লোকের মান নষ্ট করিবেন? ইহাকে ইহার পিসা আমায় ইহার স্বশুরালয়ে দিয়া আসিতে বলিয়াছেন," এই শেষ কথা শুনিবা মাত্র শিরোমণি মহাশয়ের কথায় বাধা দিয়া হীরালাল বলিয়া উঠিলেন "কি সর্ব্বনাশ! স্নেহ কি বিবাহিতা? স্নেহ শীঘ্র বল তুমি কি সত্যই বিবাহিতা"?

স্নেহ। "হাঁ বিবাহের বৃত্তান্ত পরে সব বলিব। দাদা! শীঘ্র যাহাতে মাকে দেখিতে পাই তাহার উপায় কর। মা আমার আমায় এতক্ষণ না দেখিয়া বোধ হয় জীবিত আছেন কি না সন্দেহ"।

হীরালাল। “আমি ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তবে কি তাঁহাকে না জানাইয়াই তোমাকে লইয়া যাওয়া হইতেছে? তাহাই হইবে নতুবা তোমার হাত বাঁধা থাকিবে কেন? ওঃ কি নিষ্ঠুরতা! কি নির্দ্দয়তা! চল তোমরা শীঘ্র পাল্কি লইয়া চল”। তাঁহারা পাল্কি লইয়া যাইতেছেন এমন সময় দেখেন একটি বৃদ্ধা লাঠিতে ভর করিয়া আসিতেছে। হীরালাল অনুভবে বুঝিলেন এই ঘর এই বুড়ীর। হীরালাল কহিলেন “এই ঘর কি তোমার?” বুড়ী কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল “দুই তিনটা হাঁড়ী আছে, একখানা ভাঙ্গা পাথর, একটা ভাঙ্গা ঘটি আছে তাহা তোমরা লইয়া যাইতেছ”?

হীরালাল কহিলেন “না গো আমরা তোমার ঘরের কিছুই লইয়া যাইতেছি না। ঝড় বৃষ্টির জন্য তোমার ঘরে একটু বসিয়াছিলাম।” অনন্তর ভৃত্যকে কহিলেন “বৃদ্ধাকে দুইটি মুদ্রা দাও।” বৃদ্ধা সেই মুদ্রা দুইটি পাইয়া আনন্দে অবাক হইয়া গেল।

তাঁহারা চলিয়া গেলেন। একজন ভৃত্য কহিল “তোমাদের পাল্কি লইয়া যাও”। বেহারারা পাল্কি আনিতে গেল। শিরোমণি মহাশয়ও হতবুদ্ধি হইয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই তাহারা বোটের নিকট পৌঁছিয়া বোটে উঠিলেন।

হীরালাল কহিলেন "শিরোমণি মহাশয় কেন কষ্ট পাইবেন? বোটে আসুন না নিরাপদে বাটী পৌঁছিবেন"। শিরোমণি মহাশয়ের তখন বিশ্বাস হইয়াছিল ইনি সামান্য লোক নহেন স্নেহের ভ্রাতাই হইবেন। কহিলেন "আচ্ছা আপনার সঙ্গেই যাই পথে বড় কষ্ট পাইয়াছি" এই বলিয়া বোটে উঠিলেন।

বেহারাগণ কহিল "আমাদের ভাড়া দিউন"। শিরোমণি মহাশয় কহিলেন বাড়ী গিয়া পাইবি। আর তোরা যদি আগে যাস্ তবে এই সমুদয় ঘটনা যদুনাথকে বলিস্"।

হীরালাল কহিলেন "হাঁ বলিস্ খুব ভাল বীরপুরুষকে সঙ্গে দিয়া কন্যা পাঠাইয়াছিলেন। তিনি খুব বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার জন্য শীঘ্র ব্রাহ্মণ ভোজনের আয়োজন করুন। আর দক্ষিণাটাও ঠিক রাখিবেন"।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

উদ্ধার।

অনন্তর তাহারা সকলে বোটের মধ্যে আসিয়া আর্দ্র বস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক উপবেশন করিলেন। মাঝিরা বোট খুলিয়া দিল। স্নেহ সারাদিনের উপবাসে ও ক্লেশে আর কথা কহিতে পারিলেন না, শুইয়া পড়িলেন। হীরালাল সত্বর দুগ্ধ উষ্ণ কবাইয়া স্নেহকে আহার করাইলেন। তৎপরে পাচককে আহারের আয়োজন করিতে আদেশ করিলেন।

হীরালাল স্নেহের পার্শ্বে বসিয়া তাহার সেই আর্দ্র কেশরাশি মুছাইতে লাগিলেন, আর নানাবিধ গল্প করিতে লাগিলেন। অনন্তর অল্পক্ষণের মধ্যেই চারি পাঁচ প্রকার অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া আসিল। হীরালাল স্নেহকে সস্নেহে আহারে বশাইয়া আপনিও তাঁহার পার্শ্বে আহারে বশিলেন। শিরোমণি মহাশয় এক পার্শ্বে বশিয়া কি ভাবিতেছিলেন। হীরালাল তাঁহার প্রতি চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "শিরোমণি মহাশয়! আহাব করিবেন না"? "আচ্ছা দিন নদীর উপর দোষ নাই, সারাদিনের অনাহারে প্রাণ যায়, শাস্ত্রে আছে তৃণে কাষ্টে রণে যজ্ঞে"।

তাহার এই কথা শুনিয়া হীরালাল হাসিয়া উঠি-লেন।

স্নেহের সেই শুষ্ক বদনখানিতেও ঈষৎ হাস্যের ছটা প্রকাশ পাইল। শিরোমণি মহাশয়কে আহারে বশান হইল। শিরোমণি মহাশয় বড় বড় গ্রাসে অনন্যমনে আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। আহারান্তে সকলে উপবেশন করিলেন। একজন ভৃত্য তাম্বুল আনিয়া দিল। হীরালাল ভৃত্যকে কহিলেন "শিরো-মণি মহাশয়কে তামাকু আনিযা দাও।" শিরোমণি মহাশয় সম্মুখে বসিয়া তামাকু টানিতে লাগিলেন। তৎপরে হীরালাল শিরোমণি মহাশয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য পূর্ব্বক কহিলেন, "শিরোমণি মহাশয়, আপনাদের দেশে যাইতেছি, সকলকে কহিব শিরো-মণি মহাশয় মুসলমানের নৌকায় আহাব করিয়াছেন" শিরোমণি মহাশয় চমকিত হইয়া শশব্যস্তে হুঁকা রাখিয়া রোরুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন "বাবু দোহাই আপনার আমায় নষ্ট করিবেন না"।

হীরালাল। "কেন আপনি ত বলিয়াছেন নৌ-কায় কোন দোষ নাই, আমি নিশ্চয়ই সকলের নিকট বলিব"।

শিরোমণি মহাশয় দণ্ডায়মান হইয়া আপনার উপ-বীত অঙ্গুলে জড়াইয়া যোড়হস্তে ক্রন্দন করিতে

করিতে কহিলেন "দোহাই বাবু আপনি ব্রাহ্মণের সন্তান আমার জাতি নষ্ট করিবেন না," এই বলিয়া হীরালালের পদমূলে বসিয়া পড়িলেন।

হীরালাল "করেন কি" ? "করেন কি ?" বলিয়া উত্তোলন পূর্ব্বক আপন পার্শ্বে বশাইয়া কহিলেন "আপনি বৃদ্ধ মানুষ কেন এত ব্যস্ত হইলেন" ?

শিরোমণি। "আপনি বলুন কোথাও এই কথা প্রকাশ করিবেন না" ?

হীরালাল। "আমার আবশ্যক কি ? আপনার বীরত্ব বুঝিবার জন্য এইরূপ বলিয়াছি। আপনি এখন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাউন, রাত্রি প্রায় দ্বিতীয় প্রহর অতীত হয়" ?

অনন্তর স্নেহকে ক্লান্ত দেখিয়া ইচ্ছা সত্ত্বেও সেই রাত্রে হীরালাল স্নেহের বিবাহ সম্বন্ধে আর কোন কথা উত্থাপন করিলেন না। সকলে যথাস্থানে শয়ন পূর্ব্বক সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

পরদিন প্রত্যূষেই যদুনাথের ঘাটে বোট পোঁছিল। তাঁহারা শয্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিলেন।

শিরোমণি মহাশয় এখনও নাসিকাধ্বনিতে চতুর্দ্দিক কাঁপাইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন। হীরালাল তাঁহার নিকট যাইয়া কহিলেন "মহাশয়! গাত্রো-

স্থান করুন, বেলা হইয়াছে"। "হাঁ তাই ত বেলা হইয়াছে যে," এই বলিয়া শিরোমণি মহাশয় উঠিয়া বসিয়া দুই হস্তে চক্ষুদ্বয় রগড়াইয়া কহিলেন "এ কোথায় আসিয়াছি? এ যে আমাদের ঘাটের ন্যায় বোধ হইতেছে। হাঁ আমাদের ঘাটই ত, তবে মহাশয় আমি এখন যাই"। "হাঁ জান পিসামহাশয়কে আমাদের আগমন সংবাদটা শীঘ্র দিবেন।"

অনন্তর শিরোমণি মহাশয় আপনার ভাঙ্গা ছাতি ও ছেঁড়া পাদুকা লইয়া প্রস্থান করিলেন।

স্নেহের সেই শয্যাশায়িনী জননী আপনার প্রাণপ্রিয়া নয়নতৃপ্তিদায়িনী—যাহাকে অবলম্বন করিয়া যার শুধাংশু-বদন দেখিয়া জীবিত ছিলেন সেই স্নেহের পুত্তলি স্নেহলতাকে হারাইয়া মুহুর্মুহু মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িতেছেন। এবং বৎসহারা গাভীর ন্যায় সময়ে সময়ে চিৎকার করিতেছেন। আহা! তাঁহার তৎকালীন অবস্থা বর্ণনাতীত। যদুনাথ পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন ও সময়ে সময়ে নানা রূপ প্রবোধ দিতেছেন। এইরূপ সময়ে শিরোমণি মহাশয় হীরালালের আগমনবার্ত্তা ও তাঁহার সহিত তাঁহাদের সাক্ষাত এবং স্নেহকে ফিরাইয়া আনা ইত্যাদি কহিলেন। তৎসঙ্গে আপনার বীরত্বের কথাটাও প্রকাশ করিতে ভুলিলেন না।

যদুনাথ এই সমুদয় অভাবনীয় ঘটনায় বিস্মৃত ও চিন্তিত হইলেন। তৎপরে হীরালাল ও স্নেহকে উঠাইয়া আনিতে কহিলেন।

শ্যামা এই সমুদয় শুনিয়া অতিরিক্ত আনন্দপ্রযুক্ত মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। ইতিমধ্যে স্নেহ ও হীরালাল সেই গৃহে প্রবেশ করিলেন। স্নেহ মাতাকে মূর্চ্ছিতা দেখিয়া মাতার কণ্ঠ জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। যেমন চুম্বক পাথরের আকর্ষণে লৌহ তিষ্ঠিতে পারে না, সেই রূপ মূর্চ্ছিতা শ্যামা প্রাণাধিকা তনযার স্পর্শমাত্র চৈতন্য লাভ করিলেন। এবং অমূল্য কন্যারত্নকে আপনার সেই ক্ষীণ হস্তদ্বারা বক্ষে চাপিযা ধরিলেন।

অমৃতভাষিণী স্নেহলতা লতার ন্যায় তাঁহাকে অবলম্বন করিযা রুদ্ধকণ্ঠে কহিলেন "মা! আমি কি তোমায চিরদিন দুঃখ দিতে জন্মিয়াছি? আর দুঃখ পাইওনা মা, দুঃখ কিসের নিষ্কাম্মী হও"।

শ্যামা স্নেহের সেই বিমল মুখচন্দ্র চুম্বন করিয়া কহিলেন "ছিঃ মা অমন কথা কি বলে? তোর মত সুখ আমায় কে দিতে পারে? তুই যে আমার সুখের খনি। আহা এই হতভাগিনীর গর্ভে জন্মিয়া তুই এক দিনের জন্যও সুখী হইতে পারিলি না"।

তাঁহাদের এইরূপ সন্তাপপূর্ণ ঘটনা অবলোকন

করিয়া হীরালালের গণ্ড বহিয়া অশ্রুর পর অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছিল। ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস কিঞ্চিৎ থামিলে শ্যামা হীরালালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "বাবা হীরা! এত দিন পরে কি তোর এই অভাগিনী পিসিমাকে মনে পড়িল? দাদা না আমায় এক দিন না দেখিলে থাকিতে পারেন না। আমি না হইলে যে তোদের সংসার একদিনও চলিত না"! হীরালাল শ্যামার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন "আর কেন কষ্ট দেন? আপনাদের অবস্থা দেখিয়া আমি বড়ই দুঃখ ভোগ করিতেছি। ওঃ শুদ্ধ আমাদেরই দোষে এই সমুদয় হৃদয়বিদারক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। চলুন এখন আর এক দিনও এখানে থাকা হইবে না। উঃ কি নির্দ্দয়তা"!

শ্যামার আজ এই রুগ্ন দুর্ব্বল শরীরে বলের সঞ্চার হইযাছে। শ্যামা আজ প্রায এক মাসের পর শয্যায় উঠিয়া বসিলেন। অনন্তর হীরালাল কহিলেন "স্নেহ পিসিমাকে কি রূপে বোটে উঠান যায় বল দেখি"?

শ্যামা। "এই নিকটেই ঘাট, আমার হাত ধরিয়া লইয়া গেলে আমি সচ্ছন্দে যাইতে পারিব, তুমি আমায় লইয়া চল"। তাঁহার আগ্রহ দেখিয়া স্নেহ বলিলেন "মা! আমি তবে সকলের সঙ্গে দেখা করিয়া আসি।" এই বলিয়া স্নেহ সেই স্থান হইতে উঠিয়া

যথানিয়মে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। তৎপরে গিরিবালার নিকট গিয়া দেখিলেন তিনি যাইবেন শুনিয়া গিরি কাঁদিতে কাঁদিতে আপন বড় বড় চক্ষু দুইটি লোহিতবর্ণ করিয়াছেন। স্নেহ গিরিকে বড় ভালবাসিতেন। তিনি গিরির নিকট গিয়া তাঁহার গলদেশ ধারণ পূর্ব্বক কহিলেন "ভাই! কাঁদিতেছ কেন? তুমি না বলিয়াছিলে আমি এই যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার হইলে তুমি বড় সুখী হইবে? তবে আর কাঁদ কেন দিদি!"

গিরি। "ভাই! প্রাণে প্রবোধ মানিতেছে না, স্থির থাকিতে পারিতেছে না। আহা! কাল সারাদিন তোমায় না দেখিয়া তোমার অবস্থা ভাবিয়া আমি ব্যাকুল হইয়া পাগলের মত বেড়াইয়াছি। তোমায় না দেখিয়া আমি কেমন করিয়া থাকিব"?

স্নেহ। "আমার উদ্ধার হইতেছে জানিয়া ধৈর্য্য ধর বোন, বাঁচিয়া থাকিলে আবার তোমার সহবাসে সুখী হইব" এই বলিয়া স্নেহ আপনার গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্বর একটি কাষ্ঠনির্ম্মিত বাক্স আনিলেন এবং তন্মধ্যে তাঁহার যে সকল বহুমূল্য অলঙ্কার ছিল তাহা এক একখানি করিয়া গিরিকে পরাইতে লাগিলেন। গিরি "ও কি কর"? "ও কি কর"? এতগুলি আমি লইব না ভাই" এই

বলিয়া যেমন সেই চারুবদনখানি নত করিবেন অমনি আবারও তাঁহার সুন্দর গণ্ড বহিয়া অশ্রুধারা গড়াইয়া পড়িল। স্নেহ তাহা মুছাইয়া কহিলেন "ছিঃ বোন, এই বুঝি তোমার ভালবাসা? আমি ভালবাসিয়া দিতেছি তোমায় লইতে হইবে"। ইতিমধ্যে নিরূপম সেই গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং স্নেহকে দেখিবামাত্র কাঁদিয়া ফেলিলেন! তৎসঙ্গে গিরি এবং স্নেহও কাঁদিতে লাগিলেন। স্নেহ চক্ষু মুছিয়া কহিলেন "নিরুদা! আমার জন্য তুমি অনেক কষ্ট পাইয়াছ! তুমি আমার দুঃখে দুঃখী না হইলে আমার যে কি অবস্থা হইত জানি না"।

নিরু। "এক দিনের জন্যও তোমায় সুখী করিতে পারি নাই। এই নির্দ্দয়দের নিকট আসিয়া কেবল কষ্টের বোঝাই বহিয়া গেলে। কল্যকার ঘটনা মনে পড়িলে এখনও আমি অস্থির হইয়া যাই"।

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে একজন রমণী আসিয়া স্নেহকে বলিল তাঁহার জননী তাঁহাকে ডাকিতেছেন। স্নেহ নিরূপমকে কহিলেন "নিরুদা! চলিলাম সর্ব্বদা চিঠি পত্র লিখিও"। অনন্তর স্নেহ সেই গৃহ হইতে বাহির হইয়া যদুনাথকে

প্রণাম পূর্ব্বক মাতা ও ভ্রাতার সহিত বোটে উঠিলেন। যদুনাথ এই সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন, তাঁহার মুখ হইতে একটিও বাক্য নিঃসরণ হইল না।

নিরুপম গিরি প্রভৃতি তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে বোট পর্য্যন্ত গেলেন। যতক্ষণ বোট দেখা গেল ততক্ষণ তাঁহারা চাহিয়া রহিলেন। বোট অদৃশ্য হইলে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভাই বোনে।

সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে জল স্থল ও শূন্য সমুদয় জগত আঁধারে পূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে দুই একটি করিয়া অগণ্য অসংখ্য তারকামালায় অনন্ত আকাশ ছাইয়া পড়িল। কি অপূর্ব্ব শোভা! আকাশ সিংহাসন সাজাইল, সুমন্দ মলয় ব্যজন করিতে লাগিল, সমুদ্র শতকণ্ঠে সুমধুর সঙ্গীতে মাতিয়া উঠিল। অসংখ্য ফুল সুঘ্রাণে আকুল করিয়া দশ দিকে ফুটিয়া উঠিল। বিস্ময় এ কি কাণ্ড। কার ইঙ্গিতে জগত প্রতি মুহূর্ত্তে নূতন বেশ ধরিতেছে? জীব সুখের স্বপ্নে বিভোর থাকে অথবা দুঃখের

স্বপ্নে ক্লিষ্ট থাকে সময় প্রতি মুহূর্ত্তেই বিশ্বনিয়ন্তার ইঙ্গিতে অনবরত তাহাকে নূতনভাব আনিয়া দিতেছে।

আজ স্নেহ বোটে উঠিয়া অবধি কত কথাই কহিতেছে। কখন কখন বাড়ীর কথা কহিতেছে। কখনও মাতুলালয়ের সংবাদ এক এক করিয়া, প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া হীরালালের নিকট শুনিতেছে। শ্যামার অবস্থা অন্যরূপ, তাঁহার প্রাণ আর শান্তি মানিতেছে না। তিনি কখনও শয়নে, কখনও উপবেশনে ভাবিতেছেন—"হায় কেন আসিয়াছিলাম? এক মাত্র প্রাণাধিকা সংসারের সম্বল স্নেহ আমার, তোমার সুখ শান্তি পদ্মার এই অগাধ সলিলে নিক্ষেপ করিয়া গেলাম। ভগবান! তোমার মনে কি এই ছিল? স্নেহ যে আমার, তোমার চিরদাসী তার কি এই পুরস্কার করিলে তুমি? উঃ দাদার কাছে গিয়া কি বলিব? লোকের নিকটেই বা কি বলিয়া মুখ দেখাইব?"

হীরালাল শ্যামার অবস্থা বেশ বুঝিতে পারিতেছেন। তিনি সারা দিন আর কোন প্রকারেই স্নেহলতার বিবাহের কথা জানিবার ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা উত্থাপন করিতে সাহসী হইতেছেন না। স্নেহের নিকটেই সমুদয় দিন বসিয়া আছেন। এক একবার

স্নেহলতার অনিন্দিত সুধাংশুবদনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতেছেন। সেই নিশ্বাসেই স্নেহ তাঁহার দাদার হৃদ্গত ভাব সমুদয় বুঝিয়া লইতেছেন, তাই আরও প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া নিষ্কামী বালিকা দাদার মন ভুলাইতেছেন।

সন্ধ্যার পর রাত্রির আহারাদি শেষ হইয়া গেল। শ্যামা স্নেহকে শয়নের জন্য ডাকিলেন। স্নেহ বলিলেন "মা তোমার অসুখ আছে তুমি ঘুমাও, আমি দাদার সঙ্গে একটু গল্প করি"। শ্যামা শয়ন করিলেন।

ভাই বোনে বোটের ছাদের উপর গিয়া উপবেশন করিলেন। অনেক ক্ষণ কথা বার্ত্তার পর হীরালাল এক খানি লিপি স্নেহের হাতে দিলেন। স্নেহ কহিলেন "কার চিঠি দাদা" ? "অমৃত বাবু অনেক দিন পরে" 'অমৃত' নামটি শুনিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে একবার বালিকার প্রাণটি কাঁপিয়া উঠিল।

হীরালাল বোট মধ্য হইতে একটি দীপ আনিয়া ধরিলেন। স্নেহ চিঠিখানি আদ্যপান্ত পাঠ করিয়া ঈষৎ হাসিলেন। হীরালাল জিজ্ঞাসিলেন "হাস কেন দিদি" ? "মা দুই জনকে একই ব্রতে দীক্ষিত করিয়াছেন" এই বলিয়া স্নেহ চিঠি খানি বন্ধ করিয়া হীরালালের হস্ত হইতে দীপটি লইয়া বোট মধ্যে রাখিয়া

আসিলেন। হীরালাল স্নেহলতার চরিত্রের অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তনের বিষয় নিঃস্তব্ধ অন্তরে চিন্তা করিতেছেন এমন সময় স্নেহ কহিলেন "দাদা! কি ভাবিতেছ?" হীরালাল ধীরে ধীরে স্নেহের হাতখানি ধরিয়া আপন পার্শ্বে বশাইলেন। ধীরে ধীরে কহিলেন "দিদি কোন্ উপাদানে তোমার হৃদয় গড়িয়াছ। এ সকল দেবাবাধ্য অমূল্য রত্ন কোথায় পাইলে? তোমার সঙ্গে দেখা হওয়া অবধি শত চেষ্টার পর তবে চিঠি খানি তোমার হাতে দিলাম আর তুমি হাসিলে?" স্নেহ ধীরে ধীরে কহিলেন "দাদা ক্লেশ নাই দুঃখ নাই নিষ্কামী হও"। হীরালাল অধীর চিত্তে স্নেহের ক্ষুদ্র দুই খানি হস্ত আপন হস্তে লইয়া কহিলেন—"দিদি আমার, তুমি কি বলিতেছ? প্রাণ খুলিয়া সব বলিয়া অধীর দাদাকে শান্ত কর"। স্নেহ সেই অন্ধকার নীরবতাময় নদীবক্ষে দাদার প্রমত্ত হস্ত মধ্যে আপন ক্ষুদ্র হস্ত দুই খানি লুকাইয়া কে জানে কি ভাবে দাদার স্নেহ মাখা বদন খানির প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। হীরালাল অগণ্য তারকা লোকে দেখিলেন স্নেহলতার সেই আয়ত নয়নদ্বয় হইতে স্বর্গের তেজোময় জ্যোতি বিভাসিত হইতেছে। সমুদয় বদনমণ্ডলে কি এক অপূর্ব্ব ছায়া পড়িয়া অপূর্ব্ব বেশ ধরিয়াছে। মস্তকোপরি সুনীল গগনে

নক্ষত্রমণ্ডল হাসিতেছে। সুমৃদু মলয় সমীরণ ধীরে সুধীরে হরিৎময় বৃক্ষপত্র কাঁপাইয়া পুষ্পের সুঘ্রাণ বহিয়া প্রবাহিত হইতেছে। নিম্নে নদী সুন্দরী স্তরে স্তবে তারকাহার বক্ষে লইয়া আনন্দে কুল কুল শব্দে নৃত্য করিতে করিতে বহিয়া যাইতেছে। থেকে থেকে দুই দিক হইতে দুই দল বসন্তের কোকিল ডাকিয়া উঠিল। সুদূব বিস্তৃত আকাশমার্গে পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক সপ্তসুর চড়াইয়া পাপিযা দিক হইতে দিগন্তবে চলিযা গেল। এই গম্ভীর জগতে গাম্ভীর্য্য-মাখা দুই খানি ছবি পবস্পাবেব প্রতি দৃষ্টিপাত করিযা কে জানে কি গভীর ভাবে মগ্ন!

বোটের ছাদের এক পার্শ্বে মাঝি মাল্লারা গভীর নাসিকা ধ্বনি সহযোগে ঘোর নিদ্রায মগ্ন।

বহুক্ষণ পরে স্নেহলতা বলিয়া উঠিলেন "দাদা! দাদা! কি শুনিবে তুমি? কেমন করিযা আমি সেই ভাষাহীন ভাষা বলিব? কেমন করিয়াই বা সেই অপ্রকাশক অপরূপ ভাব আমি প্রকাশ করিব?"

"দিদি তোমার সুনির্ম্মল প্রাণের কাহিনী যাহা পার বল"।

সেই পদ্মা তীবে আপন ব্রত ধাবণ, মায়ের সমাবেশের কথা, মাযের সুমধুর আশীষ বালিকা সুমধুব রবে দাদাব কাছে সকলি কহিল। কহিতে কহিতে

বালিকার গণ্ড বহিয়া প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িল। সরলা বালিকার মহাভাবের উদয় হইল। বালিকা যুক্ত করে ঊর্দ্ধ নেত্রে গদগদ কণ্ঠে মায়ের মহিমা গাইযা উঠিলেন। সেই অপূর্ব্ব গাথা শুনিয়া কার প্রাণ স্থির থাকিতে পারে? হীরালালের প্রেমময় প্রাণ আর স্থির থাকিতে পারিল না। বালিকার সুকণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া ঊর্দ্ধ নয়নে যুক্ত করে মহিমাগানে মত্ত হইলেন। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সমুদয় চরাচরে সুধা বর্ষিত হইতে লাগিল। অন্তরে সুধা, বাহিরে সুধা, সুধামাখা ছবি দুইখানি, এ তাপময় সংসারে যে তোমাদের দেখিবে সে জানিবে সুধার খণি কোথায়? এইরূপে অনেক ক্ষণ পরে উভয়ে গলবস্ত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতার বিশ্বময় অভয় চরণে প্রণিপাত করিলেন।

হীরালাল ধীরে ধীরে স্নেহের মস্তকটি ধারণ পূর্ব্বক চুম্বন করিলেন। স্নেহ ধীরে ধীরে দাদার পদধূলি মস্তকে দিলেন। হীরালাল কহিলেন "দিদি আমার, তুমি আজ আমায় নূতন জীবন দিলে। আমার অসার বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞানে এমন ভাষা নাই যাহা বলিয়া তোমায় আশীর্ব্বাদ করিতে পারি?"

"দাদা! ক্ষুদ্র আমি, কেন আমায় বাড়াও?" বলিতেই বালিকার গণ্ড বহিয়া আবার দুই ফোটা প্রেমাশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

"দিদি ক্ষুদ্র তুমি? তোমার ন্যায় অমূল্য রত্ন যাহাতে নাই তাহার আবার আছে কি? সে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান অধঃপাতে যাউক যাহাতে এ হেন অতুল অমূল্য সম্পত্তির অভাব।"

তাহাদের এইরূপ কথা বার্ত্তা হইতেছে ইতিমধ্যে শ্যামা আসিয়া বলিলেন "হিরু! তোমরা এখনও এখানে বসিয়া আছ, শুইতে আইস। হিমে রাত্রি জাগরণে অসুখ করিবে। অতঃপর সকলেই বোট মধ্যে গিয়া শয়ন করিলেন। বোটস্থিত ঘটিকা যন্ত্রে ঠং করিয়া একটা বাজিল।

অল্পক্ষণ মধ্যেই সকলে বিশ্বজননীর জাগ্রত অনন্ত ক্রোড়ে শয়ন পূর্ব্বক নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু স্নেহলতার চক্ষে আজ আর নিদ্রা আসিতেছে না। কত কথাই তাঁহার হৃদয় দিয়া অনবরত বহিয়া যাইতেছে। কতক্ষণ পরে কি জানি কি মনে করিয়া ধীরে অতিধীরে শয্যা পরিত্যাগ করিয়া উঠিলেন। ধীরে ধীরে বোট মধ্য হইতে বাহিরে আসিলেন। যেন কাহাকে অন্বেষণার্থে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। তৎপরে ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া যাঁহাকে খুঁজিতে ছিলেন, তাঁহাকে যেন না পাইয়া তৎপরিবর্ত্তে কেমন এক প্রকার শূন্যতা উপলব্ধি করত নিরাশ চিত্তে বসিয়া পড়িলেন। ক্ষুদ্র দুই খানি হস্তে

আপন চক্ষু দুইটি আবৃত করিলেন। কতক্ষণ পরে অজস্র ধারে হস্ত মধ্য দিয়া অশ্রুধারা বহিতে লাগিল।

বালিকা উদ্বিগ্নচিত্তে বলিয়া উঠিলেন, "অমৃত"! "অমৃত"! জীবন সর্ব্বস্ব! ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র আমি—আমার জন্য তোমার মহৎ বীরত্বপূর্ণ, প্রতিভাশালী জীবন নিষ্প্রভ হইল। আমি এখন কি করিব! বালিকা বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন। পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক কহিলেন—লিখিযাছেন "তুমি আমার অনুরোধ রক্ষা না করিলে আমি কদাচ এ সংসারে সুখী হইতে পারিব না"। প্রাণাধিক! তোমার ন্যায় পবিত্র, নির্ম্মল হৃদয়োপযোগী অনুরোধ কি এই? ছিঃ! তোমার উপযুক্ত লেখা হয় নাই"। আবারও বালিকার বিনিন্দিত নয়নদ্বয় অশ্রুতে পূর্ণ হইল। বালিকা বস্ত্রমধ্য হইতে চিঠিখানি বাহির করিয়া বার বার চুম্বন করিতে লাগিলেন। পরে উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কহিয়া উঠিলেন "ছিঃ আমি বড় অধম। বিমল হস্তে যাহা লিখিত হইয়াছে, পবিত্রতাপূর্ণ হৃদয়ের ভাব যাহাতে প্রকাশ পাইতেছে, তাহাকে বলিলাম "ছিঃ" ইহা আমার বড় আস্পর্দ্ধা।"

বালিকা অধীরভাবে চিঠিখানি বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। আবার কি জানি কি ভাবিয়া একবার চতু-

দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। পরে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কি জানি কেন, যেন কিছু লজ্জিত হইলেন। কে যেন তাঁহাকে ধিক্কার দিয়া বলিল ছিঃ এই কি তোমার মাতৃআজ্ঞা পালন? মা তোমায় বলিয়াছেন "ধৈর্য্য ধর, নিষ্কামী হও"। আবার সেই আঁধার রজনীতে বালিকার গণ্ড বহিয়া দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। বালিকা আবার ক্ষুদ্র হস্ত দুইখানি যুক্ত করিয়া বিচিত্র অসীম আকাশপটে চাহিয়া রহিলেন। একাগ্র চিত্তে ব্যাকুল হৃদয়ে অনন্ত আকাশ খুঁজিতে খুঁজিতে বালিকা ক্ষুদ্র রেণুর ন্যায় অনন্তে মিশিয়া গেলেন। তৎপরে বালিকা বিহ্বল হৃদয়ে কহিতে লাগিলেন "মা গো আমি তোমার কাছে যাইব। মা! শুনিয়াছি মৃত্যুকামনা তোমার অপ্রিয় কিন্তু মা অন্তর্যামিনী, তুমি ত জান আমি কেন যাইতে চাহিতেছি। আমি এ অবস্থায় এখানে থাকিলে যে তোমার প্রিয় পুত্রের জীবনব্রতের কণ্টক হইব। আমি জ্ঞানহীনা, ক্ষুদ্র আমি শুভাশুভ কি বুঝি? যাহাতে তাঁহার জীবনের কল্যাণ হয়, দায়াময়ী মা! তুমি তাই কর। আমি আবার কি প্রার্থনা করিব? তুমি যাহা করিবে তাহাই সুমঙ্গল। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হউক"।

জগতের অন্ধকার কথঞ্চিত বিদূরিত করত একা-

দশীর অল্প আয়ত চন্দ্রমা চুপে চুপে নীলাম্বরে উদিত হইল।

রজনী অবসান প্রায়। মাঝি উঠিয়া মাল্লাদিগকে "জোয়ার আসিয়াছে, উঠিয়া বোট ছাড়িয়া দেও" বলিয়া ডাকিতেছে।

স্নেহ উপাসনানন্তর ধীরে ধীরে বিশ্বজননীর দেবা-রাধ্য চরণে প্রণাম পূর্ব্বক বোটমধ্যে গিয়া মাতার পার্শ্বে শয়ন করিলেন।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

শুভ বিবাহ।

অমৃতলাল আপনার পরিণাম বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি আপনার মানসিক অবস্থা অতি শোচনীয় অনুভব করিয়া কয়েক দিন মধ্যেই মৃজাপুর চলিয়া গেলেন। তাঁহাকে এত শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া সুশীলকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন "এত শীঘ্র যে" ?

অমৃতলাল। "শুভকার্য্য শীঘ্র হওয়াই কর্ত্তব্য এইরূপ বিবেচনা করিয়া তোমাদের এক হারে গাঁথিতে আসিয়াছি। এখন চল বাড়ীর মধ্যে যাওয়া যাক"। সুশীলকুমার তাঁহার কথা বার্ত্তা ভাবগতিক দেখিয়া কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলেন। কারণ অমৃতলালের সমুদয়

কেমন এক প্রকার শূন্য শূন্য নূতন নূতন বোধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথায় শূন্যতা প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহার হাস্যের মধ্যেও কেমন এক প্রকার শূন্য ভাব প্রকাশ পাইতেছে। বুদ্ধিমান সুশীলকুমারের নিকট অমৃতলালের এই নূতন ভাব ভাল লাগিল না। তিনি অন্তরে ব্যথিত হইলেন কিন্তু প্রকাশ্যে কিছুই জিজ্ঞাসিতে পারিলেন না। অনন্তর তাঁহারা বাড়ীর মধ্যে যেখানে চক্রবর্ত্তী মহাশয় মুদ্রিত নয়নে তাকিয়ায় ঈষৎ হেলিয়া মালা জপিতেছিলেন মোহিনী তাঁহার সন্নিকট বসিয়া তাঁহার ছিন্ন জপমালা গাঁথিতেছিল সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাদিগকে বসিতে সঙ্কেত করিলেন। তাঁহারা উভয়ে উপবেশন করিলেন। তৎপরে অমৃতলাল পিতাকে কহিলেন পুরোহিত ডাকিয়া বিবাহের দিন স্থির করিয়া ফেলুন"। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ঈষৎ হাস্যের সহিত কহিলেন "তাহাই ভাল"। তৎপরে ভৃত্যকে ডাকিয়া পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া আনিতে অনুমতি করিলেন।

বালিকা মোহিনী লজ্জাপ্রযুক্ত আপন বস্ত্রাঞ্চলে মালাগুলি লইয়া সে স্থান হইতে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

অল্পক্ষণমধ্যে পুরোহিতসঙ্গে ভৃত্য উপস্থিত

হইল। পুরোহিত মহাশয়কে সাদরে আসনে উপবেশন করাইয়া, পশুপতি মহাশয় কহিলেন "দেখুন মহাশয় এই বৈশাখ মাসের প্রথমে বিবাহের দিন আছে কি না"? অনন্তর পুরোহিত মহাশয় পঞ্জিকার পাতা উল্টাইয়া অনেক ক্ষণ দেখিবার পরে কহিলেন, "দোশরা বৈশাখ বিবাহের একটা উত্তম দিন আছে"। অমৃতলাল কহিলেন উত্তম হইযাছে, আমি অদ্য হইতেই আযোজনে প্রবৃত্ত হইলাম। দিন অতি অল্পই আছে, মাঝে মাত্র দশ দিন আছে"।

পশুপতি মহাশয় কহিলেন "দিনটা এত শীঘ্র স্থির করিয়া ফেলিলে? চুনিলাল বাবুকে একটা সংবাদও দেওয়া হইল না"।

সুশীলকুমার কহিলেন "এত শীঘ্র না হইলেই ভাল হইত"।

তাঁহাদের এইরূপ কথাবার্ত্তা চলিতেছে এমন সময় সুশীলকুমারের পিতা অক্ষয়কুমার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহাকে অতি সমাদরে স্বীয় পার্শ্বে বসাইয়া বিবাহের বিষয় তাঁহাকে সবিশেষ জ্ঞাত করাইলেন। অক্ষয় বাবু সমুদয় শুনিয়া অতীব আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিলেন "মঙ্গল কার্য্য যত শীঘ্র সম্পন্ন হইয়া যায়, ততই ভাল"। আমার বিবেচনায় দোশরা বৈশাখই উত্তম দিন। সকলের

সম্মতি ক্রমে বিবাহের ঐ দিনই সুস্থির হইয়া গেল। তৎপরে অমৃতলাল উঠিয়া মাতার নিকটে শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন। মাতা অতি আনন্দিতা হইয়া পাড়ায় দুই এক ঘর বাঙ্গালী প্রতিবেশিনী ছিলেন তাঁহাদিগকে এই শুভ সংবাদ দিয়া সবিনয়ে কহিলেন "তোমাদের ভরসাতেই আমার এই কাজ, আমার মোহিনীকে তোমরা যেমন ভালবাস, আর আমাদের যে রূপ শ্রদ্ধা কর, তাহাতে তোমাদেব আর অধিক কি বলিব"? তাঁহার এই মধুব সরল বচনে সকলেই আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক তাঁহাকে উৎসাহিতা করিলেন। অনন্তর পাড়াব আর আব যাবতীয় স্ত্রীলোকদিগকে ডাকাইযা এই শুভ কার্য্যে যোগ দিতে অনুরোধ করিলেন। সকলে এই শুভ সংবাদে আহ্লাদ প্রকাশ কবিয়া উৎসাহের সহিত নানাবিধ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে কএকটা দিন চলিযা গেল। বিবাহের দিন আসিযা উপস্থিত হইল। আমোদ আহ্লাদে যথাবিহিত বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গেল। অমৃতলাল নিশ্চিন্ত হইলেন।

বিযাহান্তে সকলে আনন্দমনে নবদম্পতীকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তৎপরে আহারান্তে প্রতিবাসী পুরুষ, রমণী সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিলেন।

গৃহের তাবৎ লোক যথাস্থানে শয়ন করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন।

বিবাহের চার পাঁচ দিন পরে এক দিন অমৃতলাল সুশীলকুমার তাঁহাদের ক্ষুদ্র কুটীরের ছাতের উপর বসিয়া নানা প্রকার আলাপে প্রবৃত্ত আছেন এমন সময় একজন ভৃত্য আসিয়া অমৃতলালের হস্তে এক-খানি কাগজ প্রদান করিল। অমৃতলাল দেখিলেন, হীরালাল তাঁহাকে যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিয়া-ছেন,—লিখিয়াছেন টেলিগ্রাম পাইবামাত্র যেন তিনি রওনা হন, বিশেষ প্রয়োজন আছে। সুশীল-কুমার জিজ্ঞাসা করিলেন কিসের টেলিগ্রাম?

অমৃতলাল সঙ্ক্ষেপে তাঁহার কথার উত্তর দিয়া বলিলেন "আমি যাইবার জন্য প্রস্তুত হই, যেরূপ লিখিয়াছেন আমাকে অদ্যই যাইতে হইবে"।

তিনি আপন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপনার দ্রব্যাদি ঠিক করিয়া পর্য্যঙ্কোপরি উপবেশন করি-লেন। নানা প্রকার ভাবনা আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল। তিনি ভাবিলেন হীরালাল তাঁহাকে এইরূপ ভাবে টেলিগ্রাম করিয়াছেন কেন? তাঁহাদের কাহারও কি কোন অমঙ্গল ঘটিয়াছে? তাহাই সম্ভব। কা-হার কি হইল? সম্ভবতঃ স্নেহেরই সে অমঙ্গল হইবে। তাঁহার মস্তিষ্ক ঘুরিতে লাগিল, সমুদয় শরীর অধীর

হইয়া পড়িল, প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই আশা কুহকিনী মধুর স্বরে তাঁহার কানে কানে কি কহিল, অমনি তিনি মনে করিলেন আমি স্বধু স্বধু অমঙ্গল চিন্তা করিতেছি কেন? হয় তো স্নেহের কোন অসুখ হয় নাই, হয় তো তাহার বিবাহ হয় নাই। বোধ হয় আমাদের শুভ সম্মিলনের জন্যই কথা গোপন রাখিয়া, হীরালাল বাবু আমায় যাইবার জন্য লিখিয়াছেন। তাঁহার হৃদয় মধ্যে মুহূর্ত্তের মধ্যে এক অপূর্ব্ব আনন্দের ভাব উদয় হইল, তাঁহার যেন বল শক্তি ফিরিয়া আসিল। তিনি পিতা মাতা প্রভৃতির নিকট বিদায় লইয়া রাত্রের ট্রেণেই রওনা হইলেন।

ভগবান জানেন অমৃতলালের অনুমানের পরিণাম কি!

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

রোগশয্যা।

পাঠক মহাশয়! অনেক দিন চুনিলাল মহাশয়ের অট্টালিকায় প্রবেশ করেন নাই, চলুন উভয়ে একবার তথায় গমন করিয়া দেখি।

অট্টালিকার সম্মুখস্থ রাজপথে সেই রূপই লোক

সকল ব্যস্ত সমস্ত হইয়া যাতায়াত করিতেছে। পার্শ্ব দিয়া কল্লোলিনী জাহ্নবী অসংখ্য বীচিমালা বক্ষে করিয়া সেই রূপেই বহিয়া যাইতেছে। গঙ্গার বক্ষ দিয়া মাঝিরা সেই রূপেই উচ্চ কণ্ঠে গীত গাহিতে গাহিতে তরণী সকল বাহিয়া যাইতেছে।

চুনিলালের বাড়ী প্রবেশের রাস্তার দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ ঝাউগাছ সকল উন্নত মস্তকে বায়ুভরে সেই রূপই সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া হেলিতেছে দুলিতেছে। পার্শ্বস্থ কদম্ব বৃক্ষে সেই দুইটি পাপিয়া মুখামুখী হইয়া উচ্চ কণ্ঠে দিগদিগন্ত কাঁপাইয়া সেই রূপই মধুমাখা গীত গাহিতেছে। সম্মুখস্থ পুষ্পোদ্যানে মালিরা পূর্ব্বের ন্যায়ই জল সেচন করিতেছে। সকলি সেই তবু যেন কি নাই, কি সে? সে আনন্দ! আর সে আনন্দ বদন সকল দৃষ্ট হইতেছে না, আর সে সুমধুর গীতধ্বনি শুনা যাইতেছে না, আর সেই সুমধুর হাস্য কোলাহল শ্রুতিগোচর হইতেছে না। আর কোন সুধাংশু বদন বাতায়ন সন্নিধানে দাঁড়াইয়া জাহ্নবীর প্রতি চাহিয়া থাকে না। সমুদয় আনন্দ কোলাহল, হাস্য, গীত, সুখ, শান্তি, যেন কোন নিষ্ঠুর দস্যু কর্ত্তৃক চির দিনের জন্য অপহৃত হইয়াছে। এই প্রকাণ্ড প্রাসাদ উচ্চ মস্তকে কেমন এক প্রকার হাহাকার ভাব প্রকাশ করিতেছে। কেবল দাস দাসীগণ ম্লান·

মুখে শঙ্কিত ভাবে ব্যস্ততা সহকারে স্বীয় স্বীয় কার্য্যে তৎপর রহিয়াছে।

একখানি শকট আসিয়া বাড়ীর সিংহ-দরজায় দাঁড়াইল। তাহা হইতে একজন ইংরেজ ও একজন বাঙ্গালী নামিল। হীরালাল তাঁহাদের আগমন জানিয়া নিচে আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে করিয়া উপরে লইয়া গেলেন।

ইহাঁরা ডাক্তার, ইহাঁদিগকে কলিকাতা হইতে আনা হইল। স্নেহলতা অতিশয় পীড়িতা। দ্বিতলস্থ একটি বৃহৎ কক্ষে একখানি বিস্তৃত পর্য্যঙ্কোপরি তাঁহার সেই রুগ্ন, ক্ষীণ তনুখানি শায়িত। শয্যার এক পার্শ্বে শ্যামা ও উষাবতী বিষম উৎকণ্ঠিতা হইয়া স্নেহলতার সেই ক্ষীণ দেহলতার প্রতি অনিমিষে চাহিয়া বসিয়া আছেন। অপর পার্শ্বে দুই তিন জন ডাক্তার বসিয়া রহিয়াছেন। ভয়ানক জ্বরের প্রকোপ। বালিকা যাতনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। মাতা অনবরত অশ্রুমোচন করিতেছেন ও প্রাণপণে উদ্বিগ্ন অন্তরে শুশ্রূষা করিতেছেন।

হীরালাল ডাক্তারদ্বয় সমভিব্যাহারে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারগণ পরীক্ষায় যাহা বুঝিলেন তাহাতে বিষম শঙ্কিত হইলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কএক জন ডাক্তার অন্য এক কক্ষে একত্রিত হইয়া পরামর্শ করিয়া ঔষধ লিখিয়া দি-

লেন। হীরালাল সত্বর ঔষধ আনিতে লোক প্রেরণ করিলেন। অনন্তর ডাক্তারগণ পুনর্ব্বার রোগীর শয্যাপার্শ্বে আসিয়া বসিলেন এবং বারম্বার পরীক্ষা করিতে লাগিলেন।

শ্যামা অধীর হইয়া বার বার ডাক্তারদিগকে অবস্থা জিজ্ঞাসিতে ও পাগলিনীর ন্যায় নানা প্রকার অসংলগ্ন কথা কহিতে লাগিলেন। তাঁহার ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া সকলেই মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে স্নেহ একবার মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। শ্যামা প্রাণপুত্তলিকে জ্ঞানবিলুপ্তা দৃষ্টে একেবারে চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার এই ক্রন্দন শব্দে চুনিলাল দ্রুত পদে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং শ্যামাকে নানাপ্রকার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন "স্নেহ মূর্চ্ছিতা হইয়াছে মাত্র এখনই জ্ঞান লাভ করিবে।" সত্যই ডাক্তারদিগের যত্নে স্নেহ অতি শীঘ্রই চৈতন্য লাভ করিলেন। শ্যামা তখন স্নেহভরে কন্যার বদনের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন এবং সযত্নে স্নেহের শুষ্ক বদনে অল্প অল্প দুগ্ধ প্রদান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর চুনিলাল সাশ্রুলোচনে ডাক্তারদিগকে কহিলেন, "আমার এই বালিকা অমূল্য। আপনারা

ইহার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন, এই বালিকা আরোগ্য লাভ করিলে ইহার শরীরের ওজনে আপনা-দিগকে পুরস্কার দিব। আর অধিব কি বলিব আপনা-দের শ্রমের মূল্য নাই"। ডাক্তারগণ সবিনয়ে কহিলেন "আপনি সে জন্য কিছু মনে করিবেন না, আমাদের কর্ত্তব্য কায আমরা করিতেছি এবং সাধ্যানুসারে করিব"।

ইতিমধ্যে হীরালাল ঔষধ লইয়া উপস্থিত হই-লেন। ঔষধ সেবন কবান হইল। নিয়মিত মতে তিন চারিবার ঔষধ সেবনের পর রোগের লক্ষণ অনেক পরিমাণে ভাল বোধ হইতে লাগিল। ডাক্তার সাহেব কহিলেন "রোগীর অবস্থা ক্রমেই ভাল বোধ হই-তেছে, ক্রমে আরও ভাল হইবে আশা করা যায় অতএব আমি এখন যাই, পুনরায় বৈকালে আসিব। এই বলিয়া অপর দুই জন বাঙ্গালী ডাক্তারকে পরামর্শ দান করিয়া সেইখানে রাখিয়া চলিয়া গেলেন।

প্রেমময়ী স্নেহ ক্রমে ক্ষীণ স্বরে দুই একটি কথা কহিতে লাগিলেন। মাতার বদনের প্রতি করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া কহিলেন "মা তুমি কি কাঁদিতেছ"? শ্যামা অবরুদ্ধ কণ্ঠে কহিলেন "না মা কাঁদিব কেন? তুমি ধীরে ধীবে বলত তোমার এখন কি অসুখ করি-তেছে"? স্নেহ ধীরে ধীরে মাতার হস্তের উপর আপন

হাতখানি রাখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "আমি ভাল আছি। দাদা কোথায় মা"? হীরালাল আসিয়া নিকটে বসিয়া কহিলেন "কেন স্নেহ? কেন ডাকিতেছ দিদি"? স্নেহ হীরালালের প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "এখন ত কৈ আসিলেন না"?

হীরালাল স্নেহের কথার উত্তর দিবার মধ্যে একজন ভৃত্য আসিয়া কহিল "অমৃত বাবু আসিয়াছেন"। হীরালাল তাঁহাকে আনিতে দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। স্নেহ একবার মাতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নয়নদ্বয় মুদ্রিতকরিলেন।

শ্যামা অমৃতলালের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া বসনাঞ্চলে ঘন ঘন নয়ন মুছিতে লাগিলেন। উষাবতী ঔষধ আনিয়া কহিলেন "পিসিমা স্নেহকে ঔষধ খাওয়ান"। শ্যামা ঔষধ লইয়া স্নেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখেন স্নেহের সেই বড় বড় চক্ষু দুইটি হইতে দুই ফোটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িতেছে। শ্যামা ব্যস্ত হইয়া বসনাঞ্চলে মুছাইয়া ব্যাকুলভাবে কহিলেন "মা! তুমি আমায় সর্ব্বদা প্রবোধ দাও, ছি মা ধৈর্য্য ধর, অধীর হইও না, অসুখ বাড়িবে"। পরে ঔষধ খাওয়াইয়া বেদানা খাওয়াইতে লাগিলেন। স্নেহ মাথা নাড়িয়া অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন। এই সময়ে

হীরালাল অমৃতলালকে সঙ্গে লইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। অমৃতলাল শয্যাশায়িতা স্নেহের সেই শুষ্ক ক্ষীণ তনুর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সেই সোণার শরীরের এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল। তিনি দাঁড়াইতে অক্ষম হইয়া নিকটস্থ একখানি চৌকিতে বশিয়া পড়িলেন।

হীরালাল তাঁহার অবস্থা দেখিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "ভাই! অধীর হইয়া সর্ব্বনাশ করিও না, ধৈর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক স্নেহের নিকট গিয়া বোস"। অমৃতলাল তাঁহার এই কথায় হঠাৎ লজ্জিত হইয়া কহিলেন "কি বলিলে" হীরালাল পুনরায় কহিলেন "ধৈর্য্য ধরিয়া স্থির ভাবে স্নেহের নিকট গিয়া বোস।"

অমৃতলাল ধীরে ধীরে স্নেহের শয্যাপার্শ্বে গিয়া বসিলেন। ধীরে ধীরে স্নেহের একখানি হস্ত আপন হস্তে লইয়া কহিলেন "স্নেহ এখন কেমন আছ"? স্নেহের সেই মুদ্রিত নয়নদ্বয় হইতে পুনর্ব্বার দুই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। শ্যামা অধীর ভাবে কহিলেন "ছি মা, তুমি যে আমার বড় বুদ্ধিমতী, স্থির হইয়া অমৃতলালের কথার উত্তর দেও"। তৎপরে হীরালাল সস্নেহে স্নেহের অশ্রু মুছাইয়া কহিলেন "ছি দিদি তোমার এইরূপ অধীর হওয়া কি ভাল দেখায়"? স্নেহ নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া এক-

বার অমৃতলালের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দেখিতে দেখিতে আবার তাঁহার সেই বিশাল নয়নদ্বয় অশ্রু পূরিত হইল। অমৃতলাল স্বীয় মনোভাব গোপন করিয়া কহিলেন "স্নেহ কি করিতেছ? তুমি এইরূপ অধীর হইলে আমার এখানে থাকা অকর্ত্তব্য হই-বেক"।

স্নেহ ক্ষীণ স্বরে "কহিলেন কেন আমি কি করি-য়াছি"?

অমৃত। তোমার চক্ষে জল পড়িতেছে কেন? ইহাতে তোমার অনিষ্ট হইবে অসুখ বাড়িবে"।

স্নেহের শুষ্ক ওষ্ঠদ্বয়ে মৃদু হাস্যের দেখা দিল। সে হাস্যের মর্ম্ম অমৃতলাল বুঝিলেন। তাঁহার হৃদয় কাঁ-পিয়া উঠিল, বদন মণ্ডল ম্লান হইতেও ম্লানতর হইল। স্নেহ হাসিয়া কহিলেন "আমার কিছু হইবে না, আমার চক্ষের জল মুছাইয়া দেও, আমি আর কাঁদিব না। মা বলিয়াছেন "ধৈর্য্যধর নিষ্কামী হও"। মা আমার সকল সাধ পূর্ণ করিয়াছেন, সকল প্রার্থনা শুনিয়াছেন তবে আর কাঁদিব কেন? পৃথিবীর সকল আশা সফল হইল। আর আমার কোন দুঃখ নাই। মা আমার বড় দয়াময়ী, অতি আনন্দের সহিত এখন আমি তাঁর আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত"।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

স্বর্গারোহণ।

"এ নহে মরণ এ যে সুখের জনম।"

স্নেহ বুঝি আর বাঁচে না। পাড়ার মেয়েরা একত্রিত হইয়া বলিতেছে "স্নেহ বুঝি আর বাঁচে না। ও কি সামান্য মেয়ে ও দেবাংশী, ও এ পৃথিবীতে থাকিবে কেন? আমরা হতভাগিরাই চিরকাল থাকিব। আহা! এই বয়সে গুণই বা কত, এত সুখে থাকিয়া পরের দুঃখে এত কষ্ট পাইতে আর কেহ কাহাকে কখন দেখে নাই। তাঁহার যেমন ভিতর তেমনই বাহির। আহা কি সুন্দর সরলতা! মুখে একটি কথা নাই, সকলের সঙ্গে কেমন অমায়িক ভাব। ভগবানের ইচ্ছায় সারিয়া উঠুক তা না হ'লে শ্যামা কি আর বাঁচিবে"? বাড়ীর দাসী চাকরেরা চক্ষের জল মুছিতে মুছিতে কানা কানি করিয়া কহিতেছে "আহা! দিদিমণি আর বাঁচিল না। বাঁচিবে কেন? ওকি সামান্য মেয়ে গা, দিদিমণি আমাদের ঘরের আলো। দিদিমণির মুখে কখন চড়া কথাটি শুনি নাই। আহা! দিদিমণি দুঃখীর মা বাপ, এত দয়া মায়া আর কখনও দেখি নাই। আহা দিদিমণি কি ছিল আর পোড়া

বাঙ্গাল দেশে গিয়ে কি হো'য়ে এলো। বাঙ্গাল-দেশে গেলে কি আর কেহ বাঁচে গা। আহা দিদি-মণি স্বর্গের পুতুল; হে হরি ঠাকুর আমার দিদিমণিকে সারাইয়া দাও, তোমার নামে পাঁচসিকা হরির লুট দিব"।

হীরালাল ভাবিতেছেন স্নেহ বুঝি আর থাকে না। তাঁহার মমতাময় প্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, তিনি সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া অবিরাম সেবা করিতেছেন। উষাবতী সময়ে সময়ে অন্তরালে গিয়া রোদন করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার প্রেমময় হৃদয় ডাকিয়া ডা-কিয়া বলিতেছে "প্রাণের স্নেহ বুঝি আর বাঁচিল না"। অমৃতলাল ভাবিতেছেন "জন্মের মত বিদায় হইতে আসিয়াছি। স্নেহ আমার সর্ব্বস্ব। আমায় ছাড়িয়া কোথায় যাও তুমি, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া আমিও অনেক দিন থাকিব না"।

শ্যামার মাথার ঠিক নাই, বুদ্ধির ঠিক নাই, ভাবি-বারও শক্তি নাই, তাঁর যে কি অবস্থা তাহা ব্যক্ত করারও সাধ্য নাই। তাঁহারা এইরূপ ঘোরতর যাতনার সময় অতিবাহিত করিতেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ বাড়ীর মধ্যে পাগল পাগল বলিয়া একটা কলরব উঠিল। হীরালাল মহা উৎকণ্ঠিত হইয়া দ্রুত পদে গৃহের বাহির হইতে না হইতে দেখেন পাগল

কক্ষের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। হীরালাল দেখিয়া অবাক হইলেন। দেখিলেন যদুনাথ শূন্য পদে শূন্যগাত্রে মলিন বদনে উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহের দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার সমুদয় শরীর কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ হইয়া শোণিত নির্গত হইতেছে। চক্ষুদ্বয় জবাকুসুমসদৃশ রক্তবর্ণ, কদাচ সহজে চেনা যায় না। যদুনাথ অতিদ্রুত গতিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করত বিকট হাস্য করিয়া উঠিলেন। তাঁহার তৎকালীন শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া শ্যামা কাঁদিতে লাগিলেন।

হীরালাল মহা বিপদ বুঝিয়া যদুনাথের হস্ত ধরিয়া কহিলেন "আপনি বাহিরে আসুন"। যদুনাথ সবলে হস্ত ছাড়াইয়া কহিলেন "বুঝিয়াছি তোরা আমার স্নেহকে চুরি করিবার পরামর্শ করিয়াছিস্ না, না, তাহা হইবে না। চুরি করিস্ না তোদের পায়ে পড়ি, স্নেহ আমার সোনার স্নেহ কাঁদবে যে"। এই বলিয়া ভয়ানক চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

গৃহস্থিত সমুদয় লোক তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া নিতান্তই উৎকণ্ঠিত হইলেন। হীরালাল ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পুনরপি যদুনাথের হস্ত ধরিয়া কহিলেন "বাহিরে আসুন আপনাকে অনেক কথা বলিব"। যদুনাথ সজোরে হীরালালের হস্ত ছাড়াইয়া কহিলেন "না, না,

আমি আর তোদের কথা শুনিব না, তোরা চোর। তোদের সর্ব্বনাশ করিব শীঘ্র আমার স্নেহকে আনিয়া দে। তোরা গান শুনিবি”? এই বলিয়া পাগল নাচিয়া নাচিয়া গাহিল—

“স্নেহ আমার জীবনের ধন,
কোন চোরে তাঁরে করিল হরণ,
সেযেরে আমার সোনার বরণ,
তার জন্যই মোর জীবন ধারণ”।

স্নেহ একদৃষ্টে পিতার বিকৃতাবস্থা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। তাঁহার কপোল বহিয়া অশ্রুর পর অশ্রু বিন্দু গড়াইয়া পড়িতেছিল এবং অধর ওষ্ঠ কাঁপিতেছিল। তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক মৃদু কম্পিত স্বরে কহিলেন “বাবা! তুমি কেন এইরূপ হইলে? আমি এই যে বাবা!” হীরালাল কহিলেন “স্নেহ তুমি কথা কহিও না দিদি! ও কি তোমার চক্ষে জল কেন?” শ্যামা ব্যস্ত হইয়া স্নেহের অশ্রুজল মুছাইয়া দিলেন।

হীরালাল যদুনাথকে কহিলেন “আপনার স্নেহ যে আপনাকে ডাকিতেছে আপনি কি শুনিতে পাইতেছেন না?” যদুনাথ কহিলেন তোরা রাক্ষস, তোরা পিশাচ, তোরা চোর, আমার ননীর পুতুলকে চুরি করিয়া খাইয়া ফেলিয়াছিস্”। এই বলিয়া পাগল

ক্রমাগত কাঁদিতে লাগিলেন। হীরালাল দেখিলেন বড়ই বিষম বিপদ তখন দৃঢ় মুষ্টিতে যদুনাথের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "আসুন আপনার স্নেহকে দেখিবেন" এই বলিয়া স্নেহের শয্যাপার্শ্বে লইয়া কহিলেন "এই যে আপনার স্নেহ"। পাগল অনিমিষ লোচনে স্নেহ-লতার প্রতি চাহিয়া চাহিয়া উচ্চরবে কাঁদিয়া উঠি-লেন। তৎপরে অমৃতলালের প্রতি চাহিয়া দন্ত ঘর্ষণ পূর্ব্বক কহিলেন, "তুই চোর, আমাব স্নেহকে চুরি করিয়া খাইযা ফেলিযাছিস্। এ কখনও আমার স্নেহ নহে"। পিতৃবৎসলা স্নেহলতা পিতার ঈদৃশ শোচ-নীয় অবস্থা আর দেখিতে পারিলেন না। নযনদ্বয় নিমীলিত করিয়া কহিলেন "আহা! বাবার আমি এমন অবস্থা দেখিয়া গেলাম। বাবা! বাবা! তুমি ভাল মুখে একটি কথা কও, আমি ত তোমার আর ও রূপ ভাব দেখিতে পারি না"। বালিকার আর কথা ফুটিল না। বালিকা নীরব হইলেন। শ্যামা ব্যাকুল হইয়া হীরালালকে কহিলেন "হিরু! অবস্থা দেখিতে-ছেন শীঘ্র ওঁকে এখান হইতে লইয়া যাও"। হীরালাল অগত্যা বলপূর্ব্বক যদুনাথকে সেস্থান হইতে লইযা নিম্ন তালার একটি কক্ষ মধ্যে বদ্ধ করত উপরে উঠি-তেছেন এমন সময় দেখিলেন স্নেহের খুল্লতাত আসি-তেছেন। তিনি কিছু বিরক্তির সহিত কহিলেন

"মহাশয়! এইরূপ ক্ষিপ্ত অবস্থায় আপনি কিরূপে পিসা মহাশয়কে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন"? খুল্লতাত কহিলেন "এস্থান হইতে এক ক্রোশ দূরে আমাদের নৌকা এক স্থানে লাগান হইয়াছিল সেই স্থান হইতে আমাদের অজ্ঞাতে দাদা উঠিয়া যে কিরূপে এস্থানে উপস্থিত হইলেন, তাব্ত কিছুই বুঝিতে পারি নাই। তৎপরে তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে পদব্রজেই এখানে আসিযাছি"।

"তিনি কত দিন অবধি এইরূপ ক্ষিপ্ত হইয়াছেন"?

"স্নেহলতার বিবাহের কিছু দিন পর হইতেই একটু একটু মস্তিষ্কের গোলযোগ দেখা যায। সে-খানে অনেক চিকিৎসাদি করান হইয়াছিল কিন্তু ক্রমশই বৃদ্ধি ছাড়া কিছুতেই আরোগ্য না হওয়ায় এইখানে আনাই যুক্তিসঙ্গত বোধ হওযায আসিতে-ছিলাম।" "আচ্ছা আপনি এক্ষণে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করুন। আমরা বড় বিপদে আছি। স্নেহ ভারি পীড়িতা"।

"সে জন্য আপনি ব্যস্ত হইবেন না আমি অগ্রে স্নেহকে দেখিয়া আসি"। এই বলিয়া তাঁহারা উভয়ে উপরে উঠিয়া গেলেন। পাগল একাকী সেই রুদ্ধ কক্ষে একবার উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে, একবার হাসিতে, একবার নাচিতে, একবার গাহিতে লাগি-

লেন। এ দিকে চিকিৎসকগণ স্নেহলতার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া নাড়ীর গতি পরীক্ষা করিলেন। তাহাতে তাঁহাদের বদনমণ্ডল একেবারে ম্লান হইয়া গেল। তাঁহারা গোপনে হীরালালকে রোগীর অবস্থা জানাইলেন। হীরালাল যাহা শুনিলেন তাহাতে তাঁহার আর দাঁড়াইয়া থাকিবার শক্তি হইল না। তিনি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বজ্রাহতের ন্যায় স্নেহের শয্যাপার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। বুদ্ধিমতী উষাবতী ভাবে অবস্থা বুঝিলেন।

উষা ধীরে ধীরে শ্যামার নিকট গিয়া কহিলেন "পিসিমা আপনি সরিয়া বসুন, স্নেহ অনেক ক্ষণ খায় নাই আমি স্নেহকে দুধ খাওয়াই"।

শ্যামা এতক্ষণ আপনার অদৃষ্ট চিন্তা করিতে করিতে জড়ের ন্যায় হতচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন। এক্ষণে উষাবতীর কথায় তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল। তিনি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় ত্রস্ত দুগ্ধ পাত্র হস্তে লইয়া স্নেহের বদনে প্রদান করিতে গেলেন। কিন্তু হায়! কে আহার করিবে। এখন কি আর মা বিশ্বজননীর অতি স্নেহের ধন—স্নেহলতার এই পাখির আহারের প্রয়োজন আছে?

স্নেহ আপন ক্ষুদ্র হস্ত দুখানি আপন বক্ষোপরি স্থাপন করিয়া গভীর ধ্যানে মগ্না। মা অমৃতদায়িনী

নীর অমৃত পান করিয়া আত্মার ক্ষুধা নিবারণ করত সীম শান্তিলাভ করিতেছেন। স্নেহলতার ঈদৃশ-ব দেখিয়া শ্যামা ক্ষিপ্তের ন্যায় বারম্বার স্নেহ স্নেহ রিয়া ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই গভীর হ্বানে স্নেহের প্রফুল্লবদন ঈষৎ ম্লান হইল। স্নেহ রে ধীরে হস্ত উঠাইয়া নীরব হইতে সঙ্কেত করি-লেন। কিন্তু মায়ের প্রাণ কি ইহাতে স্থির থাকিতে রে? শ্যামা অধিকতর ব্যাকুল হইয়া ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই হৃদয়ভেদী আহ্বানে স্নেহ নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া ক্লেশমিশ্রিত ক্ষীণস্বরে কহিলেন "কেন ডাকিতেছ মা"? শ্যামা বিগলিত হৃদয়ে কহিলেন "অনেক ক্ষণ খাও নাই মা, দুধ খাও"।

"খাইলে কি তুমি সুখী হও মা"?

"ও কি কথা, তুমি খাইলে আমি সুখী হই তা কি াবার জিজ্ঞাসা করে"? এই বলিয়া অল্প দুগ্ধ হের মুখে দিলেন।

স্নেহ একবার মাত্র মুখে দিয়া কহিলেন "আর মা"।

হীরালাল শ্যামাকে স্থানান্তরে লইয়া যাইতে ষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রয়াস বৃথা হইল। ামা আরও দৃঢ় হইয়া বসিলেন।

চিকিৎসকগণ উপস্থিত দেখিয়া বিষণ্ণ হৃদ
চক্ষু মুছিতে মুছিতে বহির্ব্বাটীতে চলিয়া গেলেন।

দেখিতে দেখিতে স্নেহলতার আকর্ণ বিশাল ন
যুগল উজ্জ্বল হইতেও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল। তাঁহ
সেই সুচারু বদনমণ্ডলে অপূর্ব্ব জ্যোতি প্রকা
হইল। সেই জ্যোতিপূর্ণ বদনমণ্ডলে কে যেন আ
রাশি ঢালিয়া দিল। তিনি প্রফুল্লাননে সকলে
প্রতি একবার বিদায়সূচক দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন
তাঁহার সেই দৃষ্টির মর্ম্ম বুঝিয়া উপস্থিত সকল ব্যক্তির
হৃদয়ই বিদীর্ণ প্রায় হইয়া গেল। বালিকা তখন
শ্যামার প্রতি চাহিয়া কহিলেন "মা গো! এখন আ
মার বড় সুখের সময়, বড় শান্তির সময়, এখন আ
কাঁদিও না, তাহা হইলে আমি কষ্ট পাইব। কান্না
কিসের মা"! ধৈর্য্য ধর নিষ্কামী হও প্রার্থনা কর
শান্তি পাইবে"।

স্নেহ ধীরে ধীরে অমৃতলালের একখানি হস্ত আ
পন ক্ষীণ হস্তে গ্রহণ করিয়া, অমৃতলালের মু
প্রতি চাহিলেন, তাঁহার ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয়ে সুধামাখা হাস্যে
রেখা দেখা দিল। তাঁহার তৎকালিক মনোভা
অমৃতলাল বুঝিলেন এবং শূন্য প্রাণে সেই সুধা
ভাণ্ডার পবিত্র বদনের প্রতি অনিমিষ নয়নে চাহি
রহিলেন।

হীরালাল ব্যাকুল হইয়া স্নেহলতার নিষ্কলঙ্ক মুখ-কমলের প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া কি এক গভীর ভাবে নিমগ্ন হইয়া রহিয়াছেন, তাঁহার এখন আর বাহ্য কোন বস্তুর প্রতি লক্ষ্য নাই।

স্নেহ দাদার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া ক্ষীণ কণ্ঠে কহিলেন "দাদা! চলিলাম, আমার কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া সেই দিনের ন্যায় দয়াময়ের মহিমা কীর্ত্তন কর বল হরিবোল! হরিবোল! হরিবোল!"

ক্রমে স্নেহলতার সেই মনোহর নয়ন দুটি মুদ্রিত হইয়া আসিল। কি আশ্চর্য্য! চিরদিনের জন্য নয়ন মুদ্রিত করিয়াও স্বর্গের ছবি হাস্যবদনে রুদ্ধকণ্ঠে লিলেন "মা! এখন তবে আমায় গ্রহণ কর,"—ই বলিয়া সেই হাস্যমাখা ক্ষুদ্র ওষ্ঠদ্বয় চিরদিনের ন্য মুদ্রিত করিলেন।

"যাও স্বাধ্বী—জরা, মৃত্যু, দুঃখ, ক্লেশ রহিত ন্তিময় স্থানে, অমৃতময়ীর অমৃতকোলে, নির্ব্বিঘ্নে ম সুখে বাস কর গিয়া। সেখানে লোকবিশেষের ত্ব নাই, সেখানে হিংসা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা, কুটি-, জঘন্য ঘৃণিত প্রথা প্রভৃতি কিছুই নাই। সে-দেবতাদিগের সহিত চির সুখে তোমার অতি মাতৃআজ্ঞা পালন কর গিয়া, চির আনন্দে তো-চিরবাঞ্ছিত মায়ের অভয় চরণ পূজা কর গিয়া"।

সকলই ফুরাইল। আর কি লিখিব। শ্যামার অবস্থা লিখিতে আর আমার ক্ষুদ্র দুর্ব্বল লেখনী ত সরে না। শ্যামার ন্যায় দুঃখিনী জননী যদি কে থাকেন অনুভবেই বুঝিবেন।

পরিশিষ্ট।

সকলই ফুরাইয়াছে। ছয় মাস অবধি শ্যামা শয্যাগতা। শ্যামার ক্লেশের কথা বর্ণনাতীত। দিনের পর দিন মাসের পর মাস এইরূপে ছয় মাস অতীত হইয়া গিয়াছে। শ্যামা পূর্ণাহার করে না, লোকালয়ে মুখ দেখায় না।

হীরালাল অনেক সময় শ্যামার কাছে বসিয়া থাকেন। শ্যামা কাঁদিলেই, অধীর হইলেই "কান্না কিসের মা! ধৈর্য্য ধর নিষ্কামী হও, প্রার্থনা কর শান্তি পাইবে," স্নেহের এই মহামূল্য শেষ উপদেশ মধুর ভাবে ব্যাখ্যা করত শ্যামার সন্তপ্ত প্রাণে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া শান্তি প্রাপ্ত হন। তবুও শ্যামা থাকিয়া থাকিয়া শিহরিয়া উঠেন, প্রাণ হু হু করিয়া উঠে। স্মৃতির সহায়ে স্নেহলতার অমিয় মাখা মূর্ত্তি, অমিয়ভাব, অমিয় বাক্যাবলিই শ্যামার এখনকার একমাত্র অবলম্বন।

হীরালালের বহুতর যত্নে ডাক্তারদিগের সুচিকিৎসায় যদুনাথ ক্রমেই সুস্থাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর হীরালালের নিকট সমুদয় বিষয় সম্পত্তির ভার বুঝাইয়া দিয়া চুনিলাল সস্ত্রীক যদুনাথ ও শ্যামাকে

লইয়া হিমালয়ে গিয়া সাধন ভজনে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

কখনও হীরালাল সপরিবারে পিতৃ, মাতৃ, প্রভৃতি গুরুজনের চরণ দর্শন মানসে পিতার নিকট পর্ব্বতে গমন করেন। কখনও পিতা সপরিবারে পুত্র, পুত্র-বধূর নিষ্কলঙ্ক মুখকমল দর্শন মানসে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। হীরালাল অতি যত্ন করিয়া সুশীল-কুমার এবং মোহিনীকে আনিয়া উৎসাহের সহিত সংসার ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেছেন।

উষার সন্তানাদি হয় নাই। মোহিনীর নন্দ্যেহর পুষ্পের মত দুটি পুত্র ও একটি কন্যা হইয়াছে। উষা অতি যত্নে সন্তান নির্ব্বিশেষে তাহাদের প্রতিপালন করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। উষার প্রেম স্রোত-স্বতী নদীর ন্যায় সংসার মরুক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়া পৃথিবীকে সরস করিতেছে। উষা চিন্তা করে এমন মনোহর জগতে পাপ তাপ কেন? দুঃখ অশান্তি কেন? ঘৃণা, বিদ্বেষ, কেন? মলিনতা কুটিলতা, স্বার্থপরতা, দাম্ভিকতা কেন? উষা চিন্তা করে এত হাহাকার নিরানন্দই বা কেন? এত অপ্রেমই বা কিসের? বিশ্বজয়ী প্রেমেতেই ত সকল পরাভূত হয়। উষার কোমল উদার হৃদয় সংসারের এই দুর্ব্যবহার আর সহিতে পারে না। উষা সদাই চিন্তা করে মানুষ আপনাকে আপনি

চিনিল না! উষার মস্তিষ্ক পরহিতচিন্তনে রত, উষার নয়নদুটি পরসৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, উষার জিহ্বা পরগুণকীর্ত্তনে উন্মুক্ত, উষার কর্ণ পীড়িতের মর্ম্ম কথা শুনিতে ব্যস্ত, উষার হৃদয়খানি দেবতার সিংহাসন। উষার হস্ত দুইখানি রোগীর সেবাতে, তাপিতের অশ্রু মুছাইতে, দুঃখীকে দান করিতে, ক্ষুধিতকে অন্ন দিতে, জগতের সকল মহৎ কার্য্যে সদাই প্রবৃত্ত। উষার চরণ দুখানি সকল সৎকার্য্যে সদাই পরিচালিত। গ্রামস্থ ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী, মূর্খ, সাধু, অসাধু, আবাল, বৃদ্ধ, বনিতা, সকলেই উষার মধুময় প্রেমে মুগ্ধ হইয়া দেবীনির্ব্বিশেষে হৃদয়ের উচ্চাসনে বসাইয়া উষাকে পূজা করে।

আর মোহিনী! মোহিনী শান্ত শিষ্ট সুবোধ মেয়েটি, দিদি যা বলে তাই শুনে, যা করায় তাই করে, দিদির পদচিহ্নে পাদবিক্ষেপ করে, দিদির বস্ত্রাঞ্চল ধরিয়া বেড়ায়।

হীরালাল, সুশীলকুমার বিশ্বপতির চরণে মস্তক রাখিয়া তাঁহার কৃপা অবলম্বন করত উষার সহায়ে ধর্ম্মকর্ম্মে সংসারকার্য্যে সদাই ব্যস্ত।

সংসারের অধিকাংশ মানব ঘটনায় পরিচালিত, ঘটনাক্রমে মানব সুপথে চলিতেছে, আবার ঘটনাক্রমেই মানুষ বিপথে গমন করিতেছে, তাই আজ

আমরা দেখিতেছি ঘটনাস্রোতে ভাসিয়া যদুনাথ ধর্ম্ম পিপাসু হইয়া ব্যাকুল অন্তরে নির্জ্জনে গিরিশৃঙ্গে মহা যোগে মগ্ন রহিয়াছেন। কখন বা গিরিগুহায় প্রবেশ পূর্ব্বক ধর্ম্মাত্মা সাধুদিগের নিকট ধর্ম্মের গুহ্য বিষয় সকল একাগ্রচিত্তে শ্রবণ পূর্ব্বক তৎসাধনে দৃঢ়সংকল্প করিতেছেন।

এখন যদুনাথ সদাই ভাবেন "আমার পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত নাই"? যদুনাথের হৃদয় দিবা রজনী অনুতাপে দগ্ধ হইতেছে। একদিন যদুনাথ কাতর চিত্তে পর্ব্বতারণ্যে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। বেড়াইতে বেড়াইতে অনেক দূরে গিয়া পুষ্পারণ্যে আচ্ছাদিত একগুহা দেখিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত দেখিলেন এক যুবক সন্ন্যাসী গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। সন্ন্যাসীর বদনমণ্ডলে স্বর্গীয় জ্যোতি প্রকাশিত হইতেছে। সন্ন্যাসীকে দেখিয়া জানি না কি ভাবে যদুনাথের সর্ব্বশরীর কম্পিত হইতে লাগিল, "দেব! ক্ষমা কর, রক্ষা কর, পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাও" বলিয়া দেখিতে দেখিতে যদুনাথ ছিন্নমূল তরুর ন্যায় সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে পতিত হইয়া পড়িলেন।

সন্ন্যাসীর নিমীলিত নয়নদ্বয় উন্মীলিত হইল। সন্ন্যাসী দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে ঊর্দ্ধনেত্রে জানি না যদুনাথকে কি দেখাইয়া দিলেন। জানি না যদু-

নাথ বিভোর চিত্তে করযোড়ে, ঊর্দ্ধনেত্রে কি দেখিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যদুনাথ চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিলেন সন্ন্যাসী আর সে স্থানে নাই। তৎপরে কাতরচিত্তে যদুনাথ তিন দিন অনাহারে অনিদ্রায় অরণ্যে অরণ্যে গুহায় গুহায় সন্ন্যাসীকে অনেক খুঁজিয়াছিলেন কিন্তু অনেক খুঁজিয়াও আর সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইলেন না।

বেলা অবসান হইযাছে। মোহিনী আপন কক্ষে বসিয়া জাহ্নবী সুন্দরীর নয়নতৃপ্তিকর মধুর মূর্ত্তি দেখিতেছেন, আর কত কি ভাবিতেছেন। তাঁহার কোমলতাময় হৃদয় অনেক সময়ই পিতা, মাতার, ভ্রাতার শোকে অধীর হইয়া পড়িত। দশ বৎসর হইল পিতা মাতার মৃত্যু হইয়াছে সেই অবধি প্রাণের দাদা উদাস হৃদয় লইয়া নিরুদ্দেশ হইয়াছেন। পিতা মাতার অপার স্নেহ মনে করিয়া মোহিনী আজ কাঁদিয়া ফেলিলেন। তার পর অমৃতলাল আসিয়া তাহার পুষ্প কোমল হৃদয় অধিকার করিলেন। দাদার নির্ম্মল প্রেমের কথা যতই মোহিনীর হৃদয়পটে উদিত হইতে লাগিল ততই মোহিনীর আরক্তিম গণ্ড বহিয়া অজস্র অশ্রুধারা বহিয়া যাইতে লাগিল। উষার প্রেমে মোহিনী কাঁদিতেও সময় পায় না। আজ মোহিনী নির্জ্জনে বসিয়া অনেক কাঁদিল। মোহিনী হৃদয়

আবেগে কহিয়া উঠিল "দাদা! দাদা! দাদা গো! তুমি কোথায়? তুমি কি এজগতে নাই? একবার কি আমার দেখা দিবে না?" মোহিনীর এক বৎসরের গোলাপের মত মেয়েটি মাটীতে বসিয়া খেলা করিতেছিল সে মাতার কথা শুনিয়া মধুমাখা আধস্বরে একটী শব্দ করিয়া পরিষ্কার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চারিটি দাঁত বাহির করিয়া নির্ম্মলাননে স্বর্গের শোভা প্রকাশিত করত মধুময় হাস্য করিয়া উঠিল। মোহিনীর প্রাণ আজ ইহাতে মোহিত হইল না। মোহিনী দাদার কথা ভাবিতে ভাবিতে অধীর হইয়া পড়িয়াছেন। মোহিনী একবার সম্মুখস্থ রাজপথে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া জানি না কি ভাবে উচ্চ কণ্ঠে "দাদা! দাদা! বলিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। তাহার বালিকা কন্যা সুধা তাহার এই অবস্থা দেখিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। অপর কক্ষ হইতে উষা বালিকার চিৎকারে সত্বর সেই কক্ষে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মোহিনীকে তদবস্থায় নিরীক্ষণ করিয়া দ্রুতগতিতে মোহিনীর বদনমণ্ডলে জলসেচন করিতে লাগিলেন। তৎপরে মোহিনীর মস্তক আপন জানুর উপর উঠাইয়া ব্যস্ততার সহিত ব্যজন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যে বাড়ীর ভৃত্য পরিচারিকা সকলেই জ্ঞাত হইল ছোট বৌঠাক্-

মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। একজন দাসী অতি স্বত্বর কাঁদিতে কাঁদিতে বহির্ব্বাটীতে হীরালাল ও সুশীলকুমারকে এই সংবাদ জ্ঞাত করিল। তাঁহারা ব্যস্ত হইয়া সত্বর মোহিনীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাহার শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। অল্পক্ষণ মধ্যেই মোহিনীর চৈতন্যোদয় হইল। তৎপরে মোহিনী কাতর স্বরে সুশীলকুমারকে কহিলেন, "আমার দাদা এই রাস্তায় দাঁড়াইয়া আছেন তুমি শীঘ্র গিয়া তাঁহাকে লইয়া এস"। তাহার কথা অবসান হইতে না হইতে হীরালাল এবং সুশীলকুমার শীঘ্র অমৃতলালের অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। মোহিনী আবার কহিতে লাগিলেন দাদার পরিধানে গেরুয়া কাপড়, মস্তকে লম্বিত জটা। দাদা আমার নবীন বয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছেন।" বহুক্ষণ অন্বেষণের পর হীরালাল ও সুশীলকুমার প্রত্যাগমন করিয়া কহিলেন "কোথাও তাঁহাকে বা তাঁহার সদৃশ কোন সন্ন্যাসীকে খুঁজিয়া পাইলাম না" মোহিনী কাঁদিতে লাগিলেন। সকলে তাহাকে নানা প্রবোধ বাক্যে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। সেই সময় হইতে কোন কোন সময়ে নগরে, গ্রামে পরহিতব্রতে এক অপূর্ব্ব নিষ্কামী সন্ন্যাসীকে বিব্রত দেখা যাইত।

সমাপ্ত।